পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২০।। সংখ্যা ৩৩।। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।। ১৪ ফাল্গুন ১৩৯৩





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



আলোকচিত্রঃ অজিত দাস

মহাকরণে রোটান্ডায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ১১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সংগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের বৈঠক।

পশ্চিমবঙ্গ

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকঃ **ধীরেন্দ্র দত্ত**

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সম্পাদকীয় দপ্তরঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

বিষয়সূচি

আলোকচিত্র-রতন দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২০।। সংখ্যা ৩৩।। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।। ১৪ ফাল্গুন ১৩৯৩

রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের বৈঠক

সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় সহযোগিতার আশ্বাস

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রী অশোক বসু। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ বৃহস্পতিবার মহাকরণের রোটান্ডায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে শ্রীবসু এই আবেদন জানান। বৈঠকে উপস্থিত ১১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এদিনের বৈঠকে শ্রীঅশোক বসু বলেছেন, বুথ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির সদস্যদের মিশিয়ে নির্বাচন কর্মীদের টিম গঠনের ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচন কমিশন যে সার্কুলার পাঠিয়েছে তা জেলা রিটার্নিং অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সার্কুলারের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছেও ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। এখনও কোন উত্তর আসেনি। তবে সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির কাছ থেকে নামের তালিকা না চাইবার জন্য জেলা রিটার্নিং অফিসারদের বলা হয়েছে। তাছাড়া সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচনী কর্মীদল গঠন করার কাজ শুরু করতেও তিনি রিটার্নিং অফিসারদের বলেছেন।

বৈঠক শেষে শ্রীঅশোক বসু সাংবাদিকদের জানান, রাজনৈতিক দলগুলিকে বিনামূল্যে প্রাপ্য দু'টি করে ভোটার তালিকা নিয়ে যেতে বলেছি। এছাড়া ভোটগ্রহণ ও গণনার সময়কার নিয়মাবলী বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে যে সমস্ত দাবি অথবা সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীবসু জানান, ভোট গ্রহণের কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থীর অনুমোদিত এজেন্ট ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হতে পারে এ ধরনের কোন বক্তৃতা অথবা কোন ধর্মীয় স্থানে নির্বাচনী সভা করা চলবে না। নির্বাচনের দিন ট্রাকে লোক নিয়ে যাওয়া চলবে না। প্রতিটি বিধানসভাকেন্দ্রের জন্য প্রতি প্রার্থীকে দু'টি করে গাড়ি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে। ভোট গ্রহণের পর ব্যালট বাক্স নিয়ে যাবার সময় কোন প্রার্থী যদি অনুসরণ করতে চান তবে তার অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যালট বাক্সগুলি যে ঘরে রাখা হবে, সেই ঘরে তালা লাগাবার পর তার ওপর প্রার্থী সীলমোহর লাগাতে পারবেন।

৪ মে থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা

মাধ্যমিক পরীক্ষা ৪ মে থেকে শুরু হচ্ছে। মাধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবে ২ মে। তার দু'দিন পরে মাধ্যমিক শুরু হবে। তবে ১ দিন অন্তর পরীক্ষা হবে না। পর পর প্রতিদিন দু'টির পরিবর্তে ১টি করে পেপার পরীক্ষা হবে। মে মাসে গরম পড়বে বলে সকাল ৮টা থেকে ১১টা পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা হবে, ৪ মে, ৫ই মে, ৬ মে, ৭ই মে, ৮ই মে পর্যন্ত। ৯ মে ও ১০ মে ছুটি থাকবে। তারপর ১১, ১২, ১৩, ১৪ মে হয়ে পরীক্ষা শেষ হবে। ১৫ মে শুরু হবে এক্সটারনালদের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাও প্রতিদিন সকালে ১টি করে পেপার হবে এবং পর পর প্রতিদিন হবে। কবে কোন পেপার হবে তা শীঘ্রই জানানো হবে।

বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আলোচনাচক্রের উদ্বোধন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে ২৪ ফেব্রুয়ারি '৮৭ কলকাতার শিশিরমঞ্চে বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা বিষয়ে ছ'দিনব্যাপী এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত। উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ দত্ত বলেন, এই আলোচনাচক্রের ফলে সবচেয়ে বড় লাভ যেটি হবে তা হল বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্র, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় কতটা কাজ কীভাবে হয়েছে সে তথ্য জানা যাবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অতীতে বাংলা ভাষায় যা কিছু কাজ হয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, বিনয় কুমার সরকার, সখারাম দেউস্কর, শ্রীরামপুর মিশনারীদের উদ্যোগ ও অবদানের উল্লেখ করে বলেন বর্তমানেও বাংলায় প্রচুর বিষয় নিয়ে লেখা হচ্ছে—সাধারণ পাঠকেরা তা পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে স্কুল পাঠ্য বই-এর লেখায় প্রাঞ্জলতার অভাব খুবই দুঃখজনক। গবেষণা গ্রন্থ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, সারা পৃথিবীর বৃহত্তর পাঠক সমাজের কথা ভেবে গবেষকরা ইংরিজি ভাষায় প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু প্রথমে বাংলা

■ ৭১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ নিরোধক দিবসের ভাবনা

অতনু সাহা

কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে ভয়-ভীতি এবং এর থেকে গড়ে ওঠা কুসংস্কারগুলি বহু শতাব্দীর। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার অভাবটাই এর মূল কারণ। এই রোগ হলে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হবে এই ভয় থেকে রোগ লুকিয়ে রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এর ফলে রোগীর দেহে যেমন রোগ ছড়িয়েছে তেমনি দীর্ঘদিন ধরে একজনের দেহে এই রোগ থেকে যাওয়ায় তা অন্যের দেহে সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অথচ দেখা গেছে নিয়মিত চিকিৎসায় কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়। তাছাড়া ৮০ শতাংশ কুষ্ঠরোগীর ক্ষেত্রেই এই রোগ ছোঁয়াচে নয়। কুষ্ঠরোগ বংশগতও নয়।

৩০ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ নিরোধক দিবস। কুষ্ঠরোগ একটি সামাজিক সমস্যাও বটে, তাই সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলার জন্য সংগঠিতভাবে এ রোগের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার।

কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে মানুষের সচেতনতার অভাব এই রোগ দূর করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অসুবিধা। এই রোগ সম্পর্কে বহুদিন ধরে বিভিন্ন কুসংস্কার গড়ে উঠেছে। বহুদিন বললে সবটা বলা হয় না। বলা উচিত বহু শতাব্দী ধরে। এর ফলে একদিকে যেমন রোগী তার রোগ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন হাসপাতালে কুষ্ঠরোগের জন্য আলাদা বিভাগ খুলতেও মানুষ বাধা দিচ্ছেন। অথচ এরকম হওয়ার কোন যুক্তি নেই। কারণ কুষ্ঠরোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায় এবং পরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়াও সম্ভব। কুষ্ঠব্যাধি লেপরা বীজানু দ্বারা সংক্রামিত হয়। বীজানু আবিস্কারের পরই কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত সমস্ত ধারণারই আমূল পরিবর্তন হয়েছে। নিয়মিত চিকিৎসায় এই রোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। আগে ধারণা ছিল কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে এবং এই ধারণা থেকেই কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে ভয়-ভীতি এত প্রকট হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যাধি ছোঁয়াচে নয়। অন্য ২০ শতাংশের ক্ষেত্রে এই রোগ ছোঁয়াচে হলেও রোগ সেরে যাওয়ার পর আর ভয় থাকে না। এক্ষেত্রে রোগ থাকাকালীন অবস্থায় রোগীকে আলাদা রাখা দরকার। আরোগ্য লাভের পর তিনি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন। প্রাথমিক অবস্থা থেকে চিকিৎসা করলে অঙ্গহানিরও কোন ভয় থাকে না। আরেকটি বিষয়, কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়। আধুনিক চিকিৎসায় এই রোগ যখন সম্পূর্ণ সারানো যায় তখন গোপনীয়তার কোন প্রয়োজন নেই।

কুষ্ঠরোগের লক্ষণগুলি সকলেরই জানা উচিত। বিভিন্ন রকম লক্ষণ রয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে যেগুলি দেখা যায়, তা হলো, দেহের চামড়ার কোন অংশে রঙের পার্থক্য দেখা দিতে পারে। অসাড়তা দেখা দেয়। অসাড় পূর্ণমাত্রায় বা আংশিক দুরকমই হতে পারে। গায়ের চামড়ার কোন অংশ ফুলে উঠতে পারে। সেখানে পুড়ে গেলে বা কেটে গেলেও সাড়া পাওয়া যায় না। এছাড়া ক্ষতও দেখা দিতে পারে। এ সমস্ত লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৫.৪১ লক্ষ। সারা ভারতে রয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ রোগী। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরাজ্যে কুষ্ঠ কন্ট্রোল, সার্ভে প্রশিক্ষণ, বৃত্তি শিক্ষণ এবং চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে ৪১৭টি। গৌরীপুরে ৫৩০ বেডের এবং কালিম্পঙে ১৩৫ বেডের হাসপাতাল আছে। এছাড়া ২০ বেডের ইউনিট রয়েছে ৩২টি। এস ই টি সেন্টার (সার্ভে এডুকেশন ট্রিটমেন্ট) আছে ৭০০টি। এর সঙ্গে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং চিকিৎসার প্রসারে চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি রয়েছে কিছু বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ। বর্তমানে চিকিৎসার জন্য বহু গরিব মানুষ চিকিৎসা কেন্দ্রে যাচ্ছেন। তবে কুষ্ঠরোগী যাতে চিকিৎসা কেন্দ্রে যান তার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে আরও ব্যাপক ভূমিকা নিতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতগুলি যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তার সঙ্গে এটাকেও যুক্ত করে নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগ নির্মূল করার কথা ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, রিসার্চ ও পুনর্বাসনের জন্য ৭ম পরিকল্পনায় খরচের ১০০ ভাগ গ্রহণ করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এব্যাপারে বিদেশী নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাও প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন ওষুধ উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ওষুধ সরবরাহ এবং উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে।

এ ছাড়াও কতগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নজর দিতে হবে। যেমন, মেডিকেল কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কুষ্ঠরোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া; নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি। বিশেষ অসামাজিক ও অবৈজ্ঞানিক আইনগুলি সংশোধন করতে হবে অথবা পুরোপুরি তুলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ম্যারেজ অ্যাক্ট, লাইফ ইনসিওরেন্স রুল ফর হায়ার প্রিমিয়াম, ইলেকশন রুল ফর সেপারেট বুথ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষমতাহরণ, সার্ভিস রুল ফর লেপ্রসি পেশেন্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রোগমুক্ত লোকের মত কুষ্ঠরোগ মুক্ত লোক সামাজিক ও আর্থিক ন্যায় বিচার ও সমবিচার পাওয়ার অধিকারী। এর সঙ্গে রোগ সংক্রমণ মুক্ত বিকলাঙ্গদের সাধারণ বিকলাঙ্গদের মত চাকুরি ও পুনর্বাসনের সুযোগ দিতে হবে।

কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। রোগমুক্তদের চিরনির্ভরশীল না করে তারা যাতে পূর্ণমাত্রায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে এবং সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে বসবাস করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে এব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাঁকুড়ায় খোলা হয়েছে বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

কুষ্ঠরোগ রোধ করার জন্য মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগগুলির পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে। হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সংঘ, কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদ এবং কিছু মিশনারী প্রতিষ্ঠান এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এবছর ৩০ জানুয়ারি হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সংঘ কলকাতায় ১০টি জায়গায় প্রচার সভার আয়োজন করেছে। ছাত্র-যুব সংগঠনগুলিও এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া কুষ্ঠরোগ বিরোধী 'সিল' বিক্রি করা হয়েছে।

জীবনানন্দ ঃ বিচ্ছিন্নতা বনাম সমাজ চেতনা

প্রথমা রায়-মন্ডল

[১৭ ফেব্রুয়ারি কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিবস। এই উপলক্ষে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। স. প.]

জীবনানন্দ দাশ নির্জনতা এবং ধূসরতার কবি। সে কারণেই তিনি সমাজ বিচ্ছিন্ন, তথা জীবন বিমুখ-এমনি ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ এনে জীবনানন্দ দাস সম্বন্ধে যেমন একটা আড়াল তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, তেমনি তাকে জনগণ-বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে নির্বাসন দেবার প্রয়াস চলছে। জীবনানন্দ দাশ সত্যি কি বিচ্ছিন্ন, জীবন বিমুখ, সংসারে সন্ন্যাসী? এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

একথা ঠিক বহিরঙ্গে না হলেও অন্তর্মনে কবির মনোভূমি বড়ই নির্জন, রহস্যময়। তাঁর চেতনালোক কখনও প্রকাশিত, কখনও বা অপ্রকাশিত। আর এই প্রকাশ অপ্রকাশের লীলাখেলায় তা আরো রহস্যময় হয়ে ওঠে। কবি যেহেতু পৃথিবীর সারভূতা সত্তা, তাই পৃথিবীর সৌন্দর্যময় লীলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি স্বপ্নমাধুরীর স্মৃতি চারণায় কখনও হন মুখর, কখনও বা গভীরতর অসুখের দেশে বিষণ্ণতার ধূসরতায় হয়ে ওঠেন ম্রিয়মাণ। অন্ধকারের আবিলতায় নিমজ্জিত কবিকে কেউবা বলেন নির্জনতার কবি। জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ ও কাব্যভাষার আলোকে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আত্মকথনে একদা কবি বলেছিলেন: 'আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা' দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন অর্থে তিনি নির্জন; কিংবা আদৌ নির্জন কি না তা একবার খতিয়ে দেখা যাক। বিষয়টি কয়েকটি প্রশ্নের আকারে তোলা যাকঃ

(ক) জীবনানন্দ দাস কি জীবন বিমুখ ছিলেন?

(খ) তিনি কি বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিলেন?

(গ) তিনি কি পলায়নপর মনোবৃত্তি পোষণ করতেন?

জীবনানন্দ দাশ সংসার-সমাজে ছিলেন। লোকমানসের সংগেও ছিল তাঁর আত্যন্তিক যোগাযোগ। সংসারধর্ম পালন করতে গিয়েও তিনি ছিলেন সচেতন গৃহস্থ, স্ত্রী পুত্র সন্তানদের প্রতিও তিনি ছিলেন সজাগ। তবু তিনি নির্জন? তবে তিনি কি মানসিক দিক থেকে নির্জনপ্রিয় ছিলেন? তাইবা বলি কি করে? কবিমাত্রেই তো মনোলোকের নিজস্বভুবনে বড় একাকী নির্জন, ধ্যানমগ্ন। সেই অর্থেই কি তিনি নির্জনতার কবি? সেই অর্থে বললে তো সমস্ত কবিকেই এই অভিধায় চিহ্নিত করতে হয়। তবে তিনি কি বিচ্ছিন্নতায় রুগ্ন ছিলেন? ছিলেন কি পলায়নপর মানসিকতার ধারক? যদি তাই না হন, তবে তাকে নির্জনতার কবি বলা হয় কোন যুক্তিতে?

আসলে এর কোনটাই সরাসরি জীবনানন্দ দাশের ওপর বর্তায় না। চাপিয়েও দেওয়া যায় না। ১৯৩৯-৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তান্ডব, ধ্বংস এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকার সারা দেশকে ওলটপালট করে ফেলেছিল। তবু দেখা যায়, জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টি কিংবা কাব্যসম্ভারে তৎকালীন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছাপ তেমন সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। অথচ নজরুল সেই অর্থে ছিল অগ্নিশিখা। জীবনানন্দ দাশ তখনও সেই ধ্যানমগ্নতার নির্জনতার সাধনযজ্ঞে সমাধিস্থ হয়ে সামগ্রিক মানবজীবনের নিরন্তর নিরাশ্রয়তা ও অসহায়তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু কেন? তাঁর অনুভূতি কি বিচ্ছেদিত ছিল? তাও নয়। আসলে তাঁর অনুভূতির তীব্রতা, সামগ্রিক মানুষের দুঃখের আরো গভীর উপলব্ধিতে 'গভীরতম দেশ' থেকে মাঝে মধ্যে তাঁর সৃষ্টিতে এই বহির্মুখীন মানবিক আলোড়নকে সোচ্চার করে তুলেছেন। তা তাঁর স্বদেশধর্মী কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ জীবনানন্দ দাশের কাব্যে এই পদক্ষেপের চিত্র সীমিত ও সীমাবদ্ধ। সেই নেতিবাচকতার ইঙ্গিতও সামান্য।

তিনি ছিলেন মগ্নচৈতন্য। কিন্তু তিনি তো নিরুদ্বেগ ছিলেন না। জীবন পলাতক মানসিকতাও তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। মানুষের খন্ড-খন্ড দুঃখাবয়বকে ধরতে না গিয়ে তিনি মানুষের সামগ্রিক সংকল্পের গভীরে ডুব দিয়েছেন-চেতনা ও রক্তের লীলাখেলায় সেই গভীর বোধ মানুষকে বিস্ময়াহত করেঃ

'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে। ক্লান্ত করে। ক্লান্ত করে।'

এই শ্রান্তি ও বিস্ময়-বিপন্নতার কাজ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের চেয়েও বেশি গভীর, জ্বালাময়, স্থায়ী।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য পরিক্রমা শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ বছরে। প্রথম সম্ভার 'ঝরা পালক'। তারপর পর্যায়ক্রমে এসেছে 'ধূসর পান্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা,' 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় তাঁর কাব্যধারার পরিণতি। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এসেছে প্রেম, প্রকৃতি, ইতিহাস, সমাজ, মৃত্যু; এসেছে কিন্তু ভালবাসার রঙ ও ছবি। এসেছে বাস্তব নর-নারীর নাম, ইতিহাস ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তবে এর সবটাই এসেছে আত্মগত মগ্নচৈতন্যের রসে জারিত হয়ে। তাই মর্তজীবনে ও বাস্তবচেতনার পাড়ে দাঁড়িয়েও তিনি অসীমমুখীন, অতীত ও ইতিহাসকে তিনি হাতরে নিয়ে আসেন বর্তমানের মনসিড়ির পাশে। তিনি বলেনঃ

'দূরে দূরে আরো দূরে চলিলাম উড়ে
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা। প্রান্তরের শুষ্ক অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে।'

মানুষ বড় নিঃসহায়, বড় একা। হয়তো একা বলেই নিঃসহায় আর নিঃসঙ্গ বলেই তার মন পাড়ি দেয় সুদূর অজানায়। দূরত্বের গভীর বাধা সেখানে আড়াল হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এ পাড়ি নাগরিক কোলাহলের পথের থেকে দূরে। যেখানে 'সুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ। প্রতিদিন ভোর আসে ধানের মত সবুজ-সহজ।' বিজনে সবুজে ঢাকা গ্রামের এই নির্জন পথে জীবনানন্দের চলা-ফেরা। পরবর্তীকালে তার জীবন কেটেছে নগর সভ্যতার কোলকাতায়। কিন্তু চিরদিনই তাঁর মন পদচারণা করেছে গ্রামবাংলার সবুজ-বিজন-নির্জন পথের প্রান্তরে। তাই তিনি সহরবাসী হয়েও গ্রামবাংলার কবি। সেই রূপসী গ্রাম বাংলাই তাঁর শান্তির নীড়; যে নীড় 'একদিন স্বপ্ন ছিল-সোনা ছিল যাহা। নিরুত্তাপ শান্তি পায়; যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।' সেখানেঃ

'নক্ষত্রের মতন হৃদয় পড়িতেছে ঝরে
ক্লান্ত হয়ে শিশিরের শব্দের মতন,
জানো নাকো তুমি তার স্বাদ। তোমারে নিতেছে ডেকে
জীবন অবাধ, জীবন অগাধ।'

নির্জনতার সাধনায় কবি সন্ধান পেয়েছেন 'অবাধ-অগাধ' জীবনের। এখানেই তাঁর কবি হিসেবে অনন্যতা, সার্থকতা। তিনি বৃহত্তর বিশ্বপ্রকৃতির সুরে একাত্ম হয়েছিলেন। রূপসীবাংলা আর তারই মধ্য দিয়ে একাত্ম হয়ে ওঠার প্রেরণায় তিনি শহর, বন্দর, কারখানা ছেড়ে পালাতে এসেছেন। নেমে আসতে চেয়েছেন শ্যামল মাটিতে 'শিশিরের ভেজা পথ ধরে।'

'সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর কোলাহল।
দেশলাই জ্বেলে, আসিয়াছি নেমে তাই ক্ষেতে,
শরীরের অবসাদ হৃদয়ের জ্বরে ভুলে যেতে।'

জীবনানন্দ দাশের বিশ্বপ্রকৃতিকে এই যে ভালবাসা তা তাঁর সুপ্তধতার উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি।

নির্জনতার কবি হয়তো এই শহরেরই কোন এক ধারে একা বসে, সন্ধ্যায় দেখেছেন, কেমন করে আকাশের সাতটি তারা ফুটে ওঠে। আর সেই সঙ্গে 'কলমীর ঘ্রাণ', 'হাঁসের পালক।' 'কিশোরীর চাল ধোয়া ভিজে হাত' সব একাত্মতায় কেমন ডুবে আছে। সেই একাত্মতায় কবি অনুভব করেন 'ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা।'

জীবনের সর্বস্তরের শান্তস্তব্ধতা জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রাণবস্তু। স্তব্ধ দুপুরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকার মত সেই স্তব্ধতার প্রতিধ্বনি শোনা যায় তার কবিতায়—'কাঁচ পোকা ঘুমিয়েছে, গঙ্গাফড়িং সেও ঘুমে। আম-নিম হিজলের ব্যাপ্তীতে পড়ে আছ তুমি।' স্তব্ধতার এই বাণীরূপ একমাত্র জীবনানন্দ দাশেই সম্ভব। অন্ধকার তাই তাঁর কবিতায় মানুষের স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। অন্ধকার কবিতায় তিনি [illegible] বলেনঃ

'গভীর অন্ধকারের, ঘুমের আস্বাদে
আমার আত্মা লালিত।'

জীবনানন্দ দাশের রচনায় নির্জনতা আর একাকীত্ব যেন সর্বত্র উঁকি দেয়। উঁকি মারে 'নির্জন মাছের রঙে যেই খানে।.হয়ে আছে চুপ। পৃথিবীর একাপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ'—সেইখানে। জীবনানন্দ দাশের নদী সে-ও একাকী, নির্জন। বাবলা হোগলা, কাশবনের মধ্যে শুয়ে সে দেখে 'বিকেলের লালমেঘ।' এই বাস্তব নির্জন নদীর জল থেকে কবি চলে যান 'রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতর', যেখানে আজও কংকাবতী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মত উড়ে, আর সৌন্দর্যে রাখে হাত 'অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে।'

জীবনানন্দ দাশ মগ্নচৈতন্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েও চিত্তের প্রাচুর্যে ভরপুর। তার কবিতার ভাষা চিত্তের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনার ফসল....। তার কবিসত্তার চিত্ত ও চৈতন্য এরূপ তীব্রতম হয়ে উঠেছে বলেই কবিকে নির্জনতার গভীর সমুদ্রে ডুব দিতে হয়েছেঃ

'মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়, কোন বোধ কাজ করে—।
আমি তারে পারি না এড়াতে, সে আমার হাতে রাখে হাত।'

এই বোধই কবিচিত্ত ও চৈতন্যের পবিত্রসত্তা।

'প্রাণের আহ্লাদ, সকল লোকের মত কে পারে আবার?
সকল লোকের মত বীজ বুনে আর স্বাদ কই?'

নির্জনতার পথে পথে মহৎ করুণ ব্যঞ্জনার ছবি ফুটে উঠেছে। সকল লোকের মত হতে না পারার ব্যতিক্রম তাঁর জীবন ও মননকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই সোচ্চার অস্তিত্বের আঙিনায় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা অনুভব করেননি। করতে পারেননি বলেই তিনি সমাজ, জীবন ও মননের আরো গভীরে ডুবে থাকার সাধনায় মগ্ন ছিলেন।

কিন্তু এই নির্জনতা কিংবা একাকীত্ব কি সমাজ বিমুখ? নিরাসক্ত, নাকি অনুভব শক্তিহীন এক নৈর্ব্যক্তিক চিন্তন? তাও নয়।

'আছাড় মারিতে চাই জীবন্ত মাথার মত ঘুরে,
তবু সে মাথার চারিপাশে।'—এই বোধ বৈরাগ্যের ইঙ্গিত নয়। নির্দেশক নয় উদাসীনতার। এ যেন চারিদিকে জড়িয়ে ছড়িয়ে আছে এক ইচ্ছার অভিব্যক্তি, যা মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে চায়। এ বোধ সমাজসেবী মননের প্রতি কল্পিত প্রেমবোধের উচ্ছ্বাসময় প্রকাশ। তা শুধু সময় ও লগ্ন বুঝে সোচ্চার হয়ঃ

সকল লোকের মাঝে বসে,
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?'

জীবনানন্দ দাশের নির্জনতা, নিঃসঙ্গতার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য এইখানে। এই মুদ্রাদোষই চিত্ত ও চৈতন্যের একত্রিত অমোঘসত্তা। এ-ই তার অভ্যন্তরীণ বোধ। কিন্তু একে কোনমতেই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার প্রকাশ বলা যাবে না। এ তাঁর একাত্মবোধের শেষ পরিণতি।

মানুষকে ভালবাসার ও সমগ্র মানবিক মুক্তির পথের সন্ধানের মত তার কাব্য সত্তার গভীরতা। এই গভীর সত্তা কাজ করে বলেই খণ্ড-খণ্ড সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনসত্তায় জীবনানন্দের ধ্যানভঙ্গ হয়নি।

অথচ যারা এই পৃথিবীকে নতুন জন্ম দিতে এসেছে তাদের মন আর হৃদয় কি কবির মত? এটাই কবির প্রশ্নঃ 'তবু কেন এমন একাকী? তবু আমি এমন একাকী?' এই চরণদুটিতে একই প্রশ্নের পুনরুক্তি ও প্রশ্নচিহ্নের রূপান্তর অতীব তাৎপর্যময়। কবির একাকীত্বে সংশয় ও দ্বিধা দূর হয়ে এখানে তাকে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে। তবুও এ একাকীত্ব সংসারবিমুখ কিংবা বৈরাগ্য-সাধন নয়। তার প্রমাণঃ

'আমি সব দেবতারে ছেড়ে, আমার প্রাণের কাছে চলে আসি
সে কেন জলের মত একা একা ঘুরে কথা কয়?
অবসাদ নেই তার? তাই তার শান্তির সময়?'

জীবনের সম্ভাব্য ঘুম, আহ্লাদ এবং কবির স্বেচ্ছায় এই যে দুঃখ-বরণ, তা বৈরাগ্যের নীলকণ্ঠ সত্তা নয়।

প্রত্যেক মানুষের সর্বমুখী দুঃখ, যাতনা ও বিষাদের সংগে যুক্ত হয়েছেন বলেই কবি এই নির্জন সাধনার কঠিন পর্যায়ে নামতে সাহসী হয়েছেনঃ

'করছে শপথ, দেখিবে সে মানুষের মুখ,
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?....নষ্ট শশা
পচা চালকুমড়ার ছাঁচে যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
সেই সব।'

'নষ্টশশা' ও 'পচা চালকুমড়া'র ছাঁচের সব ফলন্তহৃদয়ে দেখবার স্থির সাধনায় তার প্রত্যয়ের সমাপ্তি। এই নির্জনতম সাধনায় কবির গভীর 'বোধ', যাকে চিত্ত ও চৈতন্যের যোগফল ও পরিণতি বলা যায়। এই স্থান বোধই জীবনানন্দ দাশের নির্জনতা ও কবিসত্তার কেন্দ্রভূমি।

দক্ষিণ বাংলায় ব্যাঘ্রপূজার লোকবৃত্ত

শ্রীগোপীনাথ সেন

সুপ্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ বাংলায় ব্যাঘ্রপূজার লোকবৃত্ত প্রচলিত আছে কারণ ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষদের দিনযাপন করতে হয়। প্রাক্ আর্য যুগে ব্যাঘ্রপূজা সারা ভারতে প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় মহেনজোদারোর বহু ক্ষোদিত প্রস্তর ফলকে কথিত আছে আর্যেতর দেবতা শিবের বাহন ছিল ব্যাঘ্র আর তাঁর ধ্যানের আসন ব্যাঘ্রচর্ম। কাল বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে শিবের বাহন হল বলীবর্দ্দ। আর্যেতর শিব ক্রমশঃ আর্যদের মধ্যে স্থান করে নিলেন তাঁর অজেয় ত্রিশূল ও ভৈরব পরাক্রমে। তাই এখনও ভারতে বহু আর্যেতর জাতির মধ্যে ব্যাঘ্র নানা আচার ও পূজার ভিতর দিয়ে বর্তমান। উত্তর ভারতে বিশেষ করে রাজপুতানায় বাঘেল রাজপুত নামে একটি গোষ্ঠী আছে। এদের পূর্বপুরুষ ব্যাঘ্রপূজা করতেন। মধ্য ভারতে বৈগা উপজাতিরা এখন ব্যাঘ্রপূজা করে থাকেন। তাঁরা কখনও ব্যাঘ্র শিকার করেন না। রাজপুতানায় ভিল উপজাতিরা মনে করেন তাঁরা ব্যাঘ্রের বংশধর। নেপালে এখনও 'বাঘযাত্রা' নামে উৎসব হয়ে থাকে। যুক্ত প্রদেশের মীরজাপুরে নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে 'বাঘেশ্বর' নামে একটি দেবতা পূজা হয়। ছোটনাগপুরের সাঁওতালগণ ব্যাঘ্রপূজা করে থাকেন। বিহারের কৃষক শ্রেণীদের মধ্যে ব্যাঘ্র দেবতা 'বনরাজা' নামে পূজিত হন। মধ্যপ্রদেশের হোসেনঙ্গাবাদে কুরকু আদিবাসীদের মধ্যে 'বাঘদেও' নামে দেবতা আছেন। হোসেনঙ্গাবাদের উপাসকদের 'বোমকাস' বলা হয়। যদি গ্রামে কোন বাঘ ঢুকে উৎপাত করে তাহলে বোমকাসগণ ব্যাঘ্রদেবতার কাছে পূজা দিলে ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম বন্ধ হয়। দাক্ষিণাত্যে ব্যাঘ্র পূজার রীতি প্রচলিত আছে। ত্রিচানাপল্লীতে ব্যাঘ্রের পিঠের ওপরে তিনটি পুরুষ দেবতার মূর্তিকে পূজা করা হয়। মধ্য প্রদেশের বন্দো আদিবাসীদের কেউ বাঘ দ্বারা হত হলে সেই মৃত ব্যক্তির যে কোন দেহের অংশ দেখতে পেলে তাঁরা তার সৎকার করেন। তাঁদের ধারণা তা না হলে মৃত ব্যক্তি 'সাইরেম' বা ভূত হয়ে কুকুরের বেশ ধরে গ্রামে উপদ্রব করতে পারে। সৎকারের পর মৃতের পরিবারের কাছ থেকে প্রায় একমণ চাল সংগ্রহ করে নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না করা হয় এবং সেই ভাত যাঁরা মৃতের সৎকার করেছে তাঁদের খাওয়ানো হয়। দিসারী বা পুরোহিত যাদু মন্ত্রপূত পানীয় সমবেত ব্যক্তিদের দেন অর্থাৎ যাঁরা বিশেষ করে ভাত রান্না করেন, তাঁরা এই জল পান করলে যদি হঠাৎ বাঘ উদয় হয় তাহলে সে তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দিসারী একটু ভাত নিয়ে ক্ষুদ্র মূর্তি তৈরি এবং তাতে লাল ও কাল মাটি দেয়। এই সময় সমবেত সকলে খুব জোরে চিৎকার করতে করতে ঢোল বাজায়। তারপর সমবেত সকলে একটি স্রোতস্বতী নদীর কাছে যায় অর্থাৎ যেখানে ভাত রান্না হয়েছে। তাঁরা এক একটি ভাতের গ্রাস মুখে সোজাসুজি করে দেয় যেন মাটিতে না পড়ে। খাওয়ার পর একসঙ্গে শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে কোন দিকে না তাকিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

আদিবাসীরা জঙ্গলে থাকার দরুণ ব্যাঘ্রপূজা ও নানা আচার-আচরণের অনুসরণ করেন। পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে সুন্দরবনের আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাঘ্রপূজার রীতিনীতি প্রচলিত আছে। এই ব্যাঘ্রপূজা সম্ভবতঃ মধ্যভারত থেকে এখানে প্রবেশ করেছিল। বাংলায় ব্যাঘ্র দেবতা হলেন দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ বাংলার জনগণ ব্যাঘ্রদেবতার পূজা দিয়ে নির্ভয়ে গভীর অরণ্যে মধু ও কাঠ আহরণের জন্য যান এবং সুন্দরবনের হিংস্র ব্যাঘ্রের কবল থেকে মুক্ত হন। কথিত আছে দক্ষিণ রায় ছিলেন ব্রাহ্মণ নগরের যশোর রাজের সেনাপতি। তাঁর উপাধি ছিল ভাটিশ্বরি। দক্ষিণ বাংলায় আঠারটি ভাটির তিনি ছিলেন শাসনকর্তা। আরেকটি ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় ক্যাপ্টেন পোল নামে একজন ইংরাজ শিকারীকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ব্যাঘ্রদেবতা হিসাবে পূজা দিতেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে বাস করতেন।

দক্ষিণ বাংলার চব্বিশ পরগনায় দক্ষিণ রায়ের বহু পূজার স্থান দেখা যায়। এই দেবতার বেশির ভাগ উপাসক হলেন মউলিয়া, মলঙ্গি, পোদ, বাগ্দি, বুনা, কাঠুরিয়া, শিকারী এবং জেলে। কিছু কিছু গ্রামে তাঁর মন্দির বট, অশথ, বেল ও নিম গাছের তলায় দেখা যায়। কোন কোন গাছের নিচে মাটির ঢিপিতে সিঁদুর মাখানো দেখলে ব্যাঘ্রদেবতার পীঠস্থান বলে মনে হবে। মকর সংক্রান্তিতে দক্ষিণ রায়ের খুব ধূমধাম করে পূজা হয় আর অন্য সময় গ্রামীণ জনগণেরা নিজেদের অভীষ্ট পূরণের জন্য পূজা দিয়ে থাকেন।

পশ্চিমবাংলায় যে কয়েকটি লৌকিক দেব দেবী আছেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ রায়ের নিজস্ব একটি বিশিষ্ট স্থান দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যতগুলি ব্যাঘ্রদেবতার মূর্তি আছে সেগুলি পুরুষকৃতি। মূর্তিগুলি উচ্চমার্গের সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং মুখাবয়ব এইভাবে সমন্বিত। তাঁর হস্তের মধ্যে আছে তীরধনুক এবং তিনি ব্যাঘ্রের ওপর সমারূঢ়। তাঁর রূপ বর্ণনায় পৌরাণিক চিন্তাধারার সমন্বয় দেখা যায় কিন্তু এর সঙ্গে আদিম প্রস্তর পূজার কোন মিল নেই।

বাংলায় লোক সাহিত্যে বহু লোক কথার প্রাধান্য দেখা যায়। পশ্চিমবাংলার ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন ও কামদলের বৃহৎ ঘটনাবহুল বিবরণ আছে। মধ্যযুগের বহু কবি রায়মঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বপ্নে দক্ষিণ রায়ের আদেশ পেয়ে এই কাব্য রচনা করেন তার কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত করা হল। রাজা প্রভাকর ঋষির নিকট থেকে শুনলেন তিনি শিবের বরে তাঁর পুত্র হবার অনুমতি পেলেন। ঋষি বললেন আমি তাঁর পুত্র হলাম। রাজা জঙ্গল পরিস্কার করে একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করলেন। কিছুদিন পরে আমি ধর্মকেতুর কন্যাকে বিবাহ করলাম। আমরা দুজনে যোগবলে দেহ পাল্টিয়ে কৈলাসে যাত্রা করলাম। হরের বরে আমি দক্ষিণের শাসনকর্তা হলাম এবং সকলের কাছ থেকে পূজা পেতে লাগলাম। কালু রায়, আমাকে হিজলি শহরে পাঠালেন কিন্তু সেখানে কেহই সম্মান দেখালেন না। সেই হেতু আমি তাঁর পুত্রকে হত্যা

করলাম এবং তাঁর জীবন ফিরে দিতে তিনি আমাকে পূজা দিতে আরম্ভ করলেন। বরদেহের একজন বণিক নাম তাঁর দেবদত্ত বহুকাল তিনি তুরঙ্গ শহরে বন্দী ছিলেন। আমার সঙ্গে মতানুবর্তিতার ফলে তাঁর একমাত্র পুত্র পুষ্পদত্ত সাতটি জাহাজ নিয়ে তাঁর পিতার খোঁজ করতে গেলেন। পথে একটি প্রতারণাপূর্বক দৃশ্য দেখে রাজাকে বললেন। রাজা এই দৃশ্য দেখতে না পেয়ে তাঁর গর্দান নিতে মনস্থ করলেন। বণিকপুত্র আমার স্মরণাপন্ন হতে আমি তাঁকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। আমি নিজে একদল বাঘ পাঠিয়ে রাজা সুরথ ও তাঁর সৈন্যদের হত্যা করি। রানী আমার কাছে এসে বহু নৈবেদ্য উপচারে পূজা দেন। তখন আমি সকলকে মার্জনা করে বাঁচিয়ে দিই। রাজকন্যার সঙ্গে পুষ্পদত্তের বিবাহ হল আর পিতাপুত্র দেশে ফিরে এল। পুষ্পদত্ত আমার জন্য বিরাট মন্দির নির্মাণ করে ভক্তি সহকারে পূজা করতে লাগলেন। রায়মঙ্গল একটি সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (পুঁথি নং ১৭০৮ (১) বি) রক্ষিত আছে।

আর একটি কাহিনীতে পাওয়া যায় বাদদরে রতাই বাউলিয়া একজন বণিকের আদেশে নৌকা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ছয় ভাই ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গভীর অরণ্যে কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁরা অধিক সংখ্যায় কাঠ সংগ্রহ করে সাত বা আটটি নৌকায় কাঠ বোঝাই করে যখন ফিরে আসছেন তখন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ তাঁদের দেহের ওপর পড়ল। সেই বৃক্ষে দক্ষিণ রায় বাস করতেন। তিনি কোপান্বিত হয়ে তাঁর অনুচর ছয়টি বাঘকে বললেন, রতাই বাউলিয়া ও তাঁর পুত্রকে হত্যা করো না। কিন্তু তাঁর ছয় ভাইকে হত্যা কর। রতাইএর ছয় ভাই ব্যাঘ্রের দ্বারা হত হল। ভ্রাতাদের দুঃখে মূহ্যমান হয়ে তিনি আত্মহত্যা করার জন্য প্রস্তুত হতেই স্বর্গ থেকে দক্ষিণ রায়ের দৈববাণী শুনতে পেলেন। দক্ষিণ রায় বললেন তিনি তাঁর ছয় ভ্রাতার প্রাণ হরণ করেছেন কারণ তিনি যে গাছে বাস করছিলেন সেই গাছটি তাঁরা কেটে ফেলেছে। তিনি আরও বললেন যদি রতাই তাঁকে পূজা দেয় ও তাঁর সন্তানকে উৎসর্গ করে তাহলে তাঁর ছয় ভ্রাতার জীবন ফিরে পাবে। দেবতা তুষ্ট হয়ে রতাইয়ের ছয় ভ্রাতার ও পুত্রের প্রাণ দান করলেন।

বরদহে রতাইএর সঙ্গে সকলে ফিরে গেলেন। বণিক যিনি রতাইকে নৌকা তৈরির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর নাম পুষ্পদত্ত। রতাইএর কাছে পুষ্পদত্ত দক্ষিণ রায়ের খ্যাতি ও মহত্ব শুনলেন। রতাই যে কাঠ সংগ্রহ করেছিলেন তাতে দক্ষতা সহকারে নৌকা তৈরি করলেন। তিনি একটি সোনার বাক্স শহরে দেখাতে লাগলেন যাতে দক্ষ কারিগর আসক্ত হয়ে ধরতে আসেন। কৈলাসাধিপতি মহাদেব সাতদণ্ডের মধ্যে সাতটি নৌকা তৈরি করার জন্য বিশ্বকর্মা ও হনুমানকে পাঠিয়ে আদেশ করলেন তাঁরা মানব দেহ ধারণ করে মর্তে এসে বণিকের কাছে তাঁদের বিবরণ পেশ করেন। তারপর তাঁরা অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। পুষ্পদত্ত পরম শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এই নৌকাগুলি পূজা করলেন আর এগুলির নাম দিলেন মধুকর। তিনি দেশের রাজাদের কাছে বিদেশ যাত্রার জন্য অনুমতি চাইলেন। রাজার নাম মদন। পুষ্পদত্ত রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'আমার দুঃখের অন্ত নেই। আমার অন্তরে বেদনা খুবই দুর্বিষহ। আপনি আমার পিতাকে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে আসবার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। আমার জন্মের পর থেকে তাঁকে আমি চোখে দেখিনি। যদিও আমি গৃহে আরামে কালযাপন করছি কিন্তু সবসময় আর রুদ্ধ বেদনা চক্ষুধারা অবিরত বয়ে যাচ্ছে। আমার মাতার দুঃখ অবর্ণনীয়। তিনি খাদ্য ত্যাগ করে মরণাপন্ন। আমার ইচ্ছে আমি পিতাকে সন্ধান করি। অনুগ্রহ করে হে রাজন আমায় অনুমতি প্রদান করুন।

রাজা বললেন 'তুমি খুবই ছেলেমানুষ, কেমন করে বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করবে? তুমি বরং বাড়ি গিয়ে আরামে দিনযাপন কর। তোমার পিতা নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। পুষ্পদত্ত অভিলাষ ত্যাগ করলেন না। রাজা তাঁকে বিদেশে যাবার অনুমতি দিলে নৌকায় নানা প্রকার দ্রব্য বোঝাই করা হল। পুষ্পদত্ত মাতা সুশীলা তাঁর বিদেশে যাত্রার বার্তা শুনে দুঃখশোকে মুষড়ে পড়লেন আর চক্ষুদ্বয় থেকে অবিরত অশ্রু বয়ে যেতে লাগল। তিনি দক্ষিণ রায়কে পূজা করে প্রার্থনা করলেন এবং বললেন হে প্রভু 'আমার আপনার বলতে আর কেউ নেই আপনি আমার একমাত্র ভরসা।' আপনার কাছে আমার নিবেদন যদি আমার পুত্র সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে আপনি তাঁকে রক্ষা করবেন। আপনার মুখমণ্ডল ইন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল হোক আর আপনার রূপরাশি কামদেবের মত প্রতিভাত হোক। 'হে দক্ষিণের রাজা' আমি আপনার ওপর নির্ভরশীল। আমাকে সখ্যপ্রেমে আবদ্ধ করুন। আমার একমাত্র পুত্রকে আপনার করুণা দিয়ে রক্ষা করুন।

দক্ষিণ রায় সুশীলার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন তিনি তাঁর পুত্রকে সকল বিপদ ও বাধা বিপত্তি থেকে রক্ষা করবেন। শুভক্ষণে পুষ্পদত্ত মধুকর নিয়ে তাঁর পিতার সন্ধানে যাত্রা করলেন। তিনি বাদদহ পিছনে রেখে কল্যাণপুরে বলরামের পূজা করলেন, হোগলা পাথরঘাটায় বারাসতের আনন্দশিবকে পূজা করে খনিয়ায় গিয়ে পৌঁছোলেন।

খনিয়ায় দক্ষিণ রায়ের স্থানে পূজা দিতে গিয়ে তাঁর সামনে পীরের একটি স্থান দেখলেন। সেখানে একদল ফকির একটি মাটির ঢিপিকে পূজা করছেন এবং দক্ষিণ রায়ের ঢিপিটির পাশে একটি মাটির মস্তকের মত দেখে তাঁর জানবার উৎসাহ হল তখন তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করতে মাঝিরা এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল একসময় বড়গাজিখাঁর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের বিবাদ হয়েছিল। কেউই কাউকে পরাজিত করতে পারছিলেন না। এই বিবাদে ধরণী ক্রমশঃ দ্বিধাবিভক্ত হতে লাগল। ভগবান তাঁদের দুজনের সামনে অর্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধ পয়গম্বর রূপ ধরে দেখা দিয়ে মীমাংসা করতে বললেন। সন্ধির শর্ত হল দক্ষিণ জেলার সব ভাটি দক্ষিণ রায়ের অধীনে থাকবে। হিজলি কালু রায়ের অধীনে হবে। সকল স্থানের জনগণ পীর বরগাজিখাঁর কবর স্থান। আর দক্ষিণ রায়ের মস্তকটিকে সম্মান করবে। যখন পুষ্পদত্তকে এই গল্পটি বলা হল তখন তিনি সেখানে দক্ষিণ রায়ের স্থানে পূজা করলেন। এরপর মগরা পার হয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছলেন। সেখানে সগর রাজার বংশ ধ্বংস এবং ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের কথা শুনলেন। তারপর তিনি রাজা মর্ত্তণ্ডের রাজত্ব পার হয়ে ওড়িষ্যার কিনারায় পৌঁছলেন। সেখানে জগন্নাথের কাহিনী শুনলেন। তারপর তাঁরা গেলেন রামেশ্বর। সেখানে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে রামায়ণের কাহিনী শুনে সেখান থেকে ক্রমশঃ এগোলেন শ্রীহৃদয়দহ, কাকদাদহ এবং জোকাদহতে। তাঁরা সমুদ্রের নানারকমের অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে দেখতে ভেসে চললেন। পুষ্পদত্তের একটি অতিশয় আশ্চর্যজনক দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হল যেন তিনি দেখলেন সমুদ্রের ভিতর কয়েকটি অত্যাশ্চর্য সুরম্য প্রাসাদ।

সমুদ্র পার হয়ে পুষ্পদত্ত তুরঙ্গ শহরে সাতটি নৌকা নিয়ে নঙ্গর করলেন। রাজা খবর পেয়ে তাঁর প্রধান পাহারাওয়ালাকে খবর নিয়ে আসতে বললেন। পুষ্পদত্ত কিছু উপঢৌকন দিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পথে যেতে যেতে তুরঙ্গ শহরের বৈভব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তুরঙ্গরাজ সুরথের কাছে তাঁর পরিচয়-পত্র ও উপঢৌকন দিতে তিনি সন্দেহে তাঁর আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। বণিক বললেন 'হে নরপতি আমার বার্তা শুনুন। আমি

বুদদহ শহরের অধিবাসী সেখানে মহান রাজা মদন রাজত্ব করেন। আমার পিতার নাম দেবদত্ত। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি বহুকাল ঘরছাড়া, আমি তাঁরই খোঁজে এখানে এসেছি। আমার নাম পুষ্পদত্ত। রাজা তাঁর পিতার প্রতি ভক্তি দেখে সাধুবাদ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন কেমন করে তিনি এখানে এলেন। পুষ্পদত্ত তাঁর কথা প্রসঙ্গে সমুদ্রে আসার বর্ণনা করতে গিয়ে সমুদ্রে অদ্ভুত প্রাসাদের দৃশ্য রাজাকে বলতে তিনি বললেন যদি তুমি সমুদ্রে প্রাসাদ না দেখাতে পার তাহলে সমুচিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। পুষ্পদত্ত রাজা সুরথকে রাজদহে প্রাসাদ দেখাতে রাজদহে নিয়ে গেলেন বটে কিন্তু তা দেখাতে ব্যর্থ হলেন। রাজা কোপান্বিত হয়ে প্রহরীকে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে গর্দান নিবার আদেশ দেন।

পুষ্পদত্ত যখন কারাগারে নিক্ষেপ হলেন তখন তিনি দক্ষিণ রায়ের স্তবগান করতে লাগলেন। তাঁর স্তবগানে সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণ রায় তার নিরাপত্তার জন্য অভয় দান করলেন।

তার পরের দিন যখন প্রহরী তাঁকে আবদ্ধভূমিতে আনয়ন করল তখন দক্ষিণ রায়ের আজ্ঞায় একদল ব্যাঘ্র তুরঙ্গ শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করল। শহরবাসী প্রাণভয়ে যে যেখানে পারল পলায়ন করল আর যারা ব্যাঘ্রের সামনে পড়ল তারা প্রাণ দিল। ব্যাঘ্র প্রহরীদের ছিন্নভিন্ন করে তাদের শেষ করে দিল। দক্ষিণ রায় আবদ্ধভূমিতে এসে ভক্তকে রক্ষা করলেন। তিনি রাজা সুরথের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। রাজা বীরত্বের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন।

রানীর কাছে খবর পৌঁছল যে রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। রানী তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে রোদন করতে করতে বললেন 'হায় আমার কি হবে? মৃত রাজার রক্তাপ্লুত দেহের ওপর পড়ে বলতে লাগলেন কোন দেবতা আমাকে এরকম শাস্তি দিলেন'। দক্ষিণের রাজা রথারূঢ় হয়ে শূন্য থেকে রানীকে সম্ভাষণ করে বললেন 'আমি দক্ষিণের রাজা কিন্তু আমাকে কোন পূজা উপচার প্রদান করিসনা এত তোর ধৃষ্টতা আর আমার স্ত্রী ভক্তের মুণ্ডচ্ছেদ করতে যাস।' বৃথা তোর ক্রন্দন এখন তুই প্রতিজ্ঞা কর তোর কন্যার সঙ্গে বণিক পুষ্পদত্তের বিবাহ দিবি এবং যদি রাজা আমার মূর্তি স্থাপন করে পূজা করে তাহলে জীবন ফিরে পাবে।' দক্ষিণ রায়ের কাছে করজোড়ে রানী তাঁকে পূজা দিবার প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি অমৃত কুণ্ড থেকে জল বর্ষণ করতেই রাজা ও মৃত সৈন্যরা বেঁচে উঠলেন। রাজারানী তাঁদের কন্যা রত্নাবতীর সঙ্গে পুষ্পদত্তের বিবাহ দিলেন। দক্ষিণ রায় পুষ্পদত্তকে বলেছিলেন রাজা সুরথের কারাগারে তাঁর পিতা বন্দী আছেন আগে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করতে। পুষ্পদত্ত রাজাকে তাঁর পিতার মুক্তির দাবি জানাতে রাজা সম্মত হলেন। পুষ্পদত্ত বন্দীদের ভিতর থেকে পিতাকে উদ্ধার করলেন। রাজদহে দেবদত্ত যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন তা তাঁর পিতাও দেখেছিলেন তিনি রাজাকে দেখাতে অসমর্থ হওয়ার জন্য তাঁকে এই বন্দীদশা ভোগ করতে হয়েছে। পুষ্পদত্ত তাঁর পরিচয় দেবদত্তকে দিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হল। পুষ্পদত্ত রত্নাবতীকে বিবাহ করে ও পিতাকে মুক্তি করে সাত নৌকা মধুকরকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। তাঁর মা আনন্দিত হয়ে নববধূকে পরম সমাদরে গৃহে বরণ করলেন।

দক্ষিণ রায়ের মহত্ব ও গৌরব শুনে রাজা মদন তাঁর পূজা করতে লাগলেন। দেবদত্তও যথারীতি ভক্তিভরে তাঁর পূজা করতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে দক্ষিণ রায়ের পূজা প্রচারিত হল।

রাইমঙ্গলের মূলখণ্ডে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বরগাজিখাঁর যুদ্ধের বর্ণনা আছে। এই খণ্ডটি ব্যতিরেকে গল্পটি চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি বণিকের গল্প বলে মনে হয় এতে কিছু ঐতিহাসিক সত্যতা আছে। দক্ষিণ রায় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সুতরাং বড়গাজিখাঁও সুন্দরবন অঞ্চলের ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন।

মুসলমান লোককবিগণ এ সম্বন্ধে বহু লোক গীত রচনা করেছেন। হিন্দু ও মুসলমানের কাছে সমান ভাবে বাঘের ভীতি বর্তমান। সকলেই বাঘের হিংস্র কবল থেকে মুক্ত হতে চান। সেজন্য রায়মঙ্গলে মূলভাগটি মুসলমানদের কাছে খুবই প্রিয়। একটি কবিতায় বনবিবি জোহুরার সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের বহু কবিতার মিল আছে। একটি কবিতার কাহিনীতে দেখা যায় 'কলিঙ্গতে একজন সওদাগর বাস করতেন। একদিন তিনি সুন্দরবন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করতে নৌকা করে বেরোলেন। তাঁর ভাগিনা তাঁর সঙ্গে গেল। এই ছেলেটি বিধবার একমাত্র সন্তান নাম তার দুখে। গভীর অরণ্যে পাঠিয়ে দুখের মা বনবিবিকে রোদন করে বলল 'আপনি অসহায়ের মাতা সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা ও কষ্টের পরিত্রাতা। মা আমি প্রার্থনা জানাই আমার প্রিয়তম দুখের ওপর সদয় হয়ে তাকে রক্ষা করুন।'

বণিক তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে দক্ষিণ রায়কে পূজা করে বণিক নৌকা থেকে অবতরণ করলেন। বণিক ও তাঁর লোকজন অরণ্যের মাঝে মধু সংগ্রহের জন্য গেলেন। দুখে নৌকায় থেকে গেল। তাঁরা সারাদিন বনে ঘুরে এক ফোঁটাও মধু সংগ্রহ করতে পারল না। দক্ষিণ রায় তাঁদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে মধু লুকিয়ে রেখেছিলেন। বণিক ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা হতাশ হয়ে সন্ধ্যায় নৌকায় ফিরে এলেন। এই সময় দক্ষিণ রায় বণিককে স্বপ্নে দেখা দিলেন। বণিক তাঁকে দেখে তাঁর কষ্টের কথা বর্ণনা করলেন। তাঁকে নিবেদন করলেন মধু ও মোম দিবার জন্য তা নাহলে তিনি দেবতার চরণে আত্মবিসর্জন দেবেন। দক্ষিণ রায় তাঁকে বললেন যদি বণিক তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারে তাহলে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি বললেন আগে দুখেকে তাঁর কাছে বলি দিতে হবে। প্রথমে বণিক তাতে রাজি হলেন না পরে দক্ষিণ রায়ের কাছে দুখেকে উৎসর্গ করতে মনস্থ করলেন। দেবতা খুশি হলেন এবং তাঁর নৌকা মধু ও মোমে ভরে দিলেন। যখন তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন তখন তিনি দুখেকে ধাক্কা দিয়ে পাড়ে ফেলে দিলেন। কোনরকমে দুখে পাড়ে গিয়ে উঠল। দক্ষিণ রায় বুঝতে পেরে বাঘকে আদেশ করলেন। দুখে চোখ বন্ধ করে বনবিবিকে স্মরণ করতে লাগল। তিনি এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের মত দুই থাবা দেখালেন। বনবিবির আজ্ঞায় তাঁর ভ্রাতা জঙ্গলি দক্ষিণ রায়কে বিতাড়ন করতে উদ্যত হলেন। দক্ষিণ রায় সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে জোন্দাগাজি বা বড়গাজিখাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁকে অভয় দান করলেন। বনবিবিও দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করলেন। এই কাহিনীতে দক্ষিণ রায়ের ওপর বনবিবির প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু রায়মঙ্গলে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড়গাজিখাঁর সমঝোতাই দেখানো হয়েছে।

কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গলের আধুনিক কবি হলেও তিনি বলেছেন তাঁর পূর্বে মাধবাচার্য ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে একটি কাব্য রচনা করেন। মনে হয় বিখ্যাত মাধবাচার্য চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা কিন্তু মাধবাচার্যের রায়মঙ্গল নামে কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রামে গঙ্গামঙ্গল নামে তাঁর একটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরাম প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লোক কবিতায় রায়মঙ্গলের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর উক্তি থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হলঃ

"শুনুন হে গুণীজন, এই অদ্ভুত কবিতার জন্মকথা। খাসপুর নামে একটি সুন্দর পরগণা ছিল। তার ভিতর বাদিসিয়া নামে একটি স্থান আছে। ভাদ্রমাসের একটি সোমবারে আমি সেখানে গিয়াছিলাম। রাত্রে একজন গোয়ালার গৃহে নিদ্রা যাই। সেই গৃহটি তালপাতায়

□ ৭১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলা রূপকথার নিজস্বতা

শ্রীমতী রীতা ঘোষ

লোক কাহিনীর যতগুলি ধারা আজও সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষের মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে, তার মধ্যে সম্ভবত জনপ্রিয়তম হল রূপকথা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সামগ্রিকতার বিচারে বলা যায় যে, এ শুধুই তেপান্তরের মাঠের পারের, সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ধারের রাক্ষসপুরীতে বন্দিনী কুঁচবরণ কন্যার উদ্ধারের কাহিনী ছাড়া বুঝি বা আর কিছুই নয়। কিন্তু এই আর কিছুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর জনপ্রিয়তার চাবিকাঠিটি। রামায়ণ যেমন শুধু বন্দিনী সীতার উদ্ধারের কাহিনী নয়–রামায়ণে যেমন সমস্ত পাঠকই জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে নিজের প্রতিরূপ খুঁজে পায়, ঠিক তেমনি করেই রূপকথাগুলির মধ্যেও আমরা নিজেরই প্রতিচ্ছবিকে চিনে নিতে পারি, পারি নিজেদের যাচাই করে নিতেও। সেই আর কিছুটি কি?

সেই বস্তুটি জল এর প্রতীকধর্মী প্রবনতা। রূপকথাকে শিশুপাঠ্য বলে মনে করার প্রবনতা বয়স্কদের মহলে প্রচলিত থাকলেও, মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে তার অবদান এই প্রতীকের সূত্রেই সর্বজনীন। রূপকথার বহু বিচিত্র চিত্রকল্প, উপমা, ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ তাই পুরাণকথার মতই প্রবাদ-প্রবচনেরও অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বহু আধুনিক রোমান্টিক বাঙালী কবিরা বহুসময়েই রূপকথার ভাবানুবাদ কবিতার মধ্যে রসের পরিপূরক হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

এই সবকটি কথাই আমাদের বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লোককথার বিশ্বজনীন সূত্রের সঙ্গে সমতা রেখে বাংলা রূপকথাগুলিও আবর্তিত এবং বিবর্তিত হতে হতে চলেছে, যার রেশ অবন ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা' বা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'রাক্ষস-খোক্কসে'ও আমরা পাই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে বিশ্বজনীন রূপকথার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা রূপকথাকে আমরা পৃথক করে চিনে নেব কি করে? সত্যিই কি তেমন কোনো উপায় বা পথ আমাদের সামনে খোলা আছে?

আমরা বাঙালীরা বলব নিশ্চয় আছে; বাংলা রূপকথার এমন কিছু সমাজতত্ত্বগত এবং রূপতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা পৃথিবীর আর কোনো দেশের রূপকথায় আমরা পাই না। সচরাচর বাংলা রূপকথাকে আমরা ইংরেজী 'Fairy tale'-এর সঙ্গে সমার্থক বলেই গণ্য করে থাকি। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ত এই সমীকরণ প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কিছুটা ভিন্নধর্মিতা অন্তত উপাদানগতভাবে আছেই। তুলনায় বরং জার্মানীর Marchen বা ফিনল্যান্ডের Sager-এর সঙ্গে বাংলা রূপকথার সম্পর্ক অনেক বেশি নিকটতর। 'Fairy-Tale' প্রসঙ্গে বলা যায় যে যেগুলি প্রাচীনতর ঐতিহ্যগত বাংলা রূপকথা, সেখানে পরীর দেখা পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে আরব্যোপন্যাস বা পারস্যকাহিনীর সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে যুক্ত ভারতের মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে সব রূপকথাগুলি গড়ে উঠেছে, তাতে জিন-পরীর দেখা কতকাংশে যে মেলে না, এমন নয়। তবে সেগুলি যে আমাদের পরম্পরাগত রূপকথা নয়, তা বলাই বাহুল্য।

এই পরীর অভাবটুকু পূরণ করতে আমাদের বাংলা রূপকথার সেই আদি কথকরা আমদানী করেছেন পক্ষীরাজ ঘোড়া। সাধারণ ঘোড়ার অতি দ্রুতগতির সঙ্গে পরীর পিঠের ডানাদুটিকে ঘোড়ার পিঠে লাগানো হয়েছে। যে কাজ পরী অতি দ্রুততার সঙ্গে অবিশ্বাস্য গতিতে ইউরোপীয় Fairy-Tale-এ করেছে, ঠিক সেই কাজই আমাদের বাংলা রূপকথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া করেছে। এটি বাংলার রূপকথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

পরী তথা Fairy থাকুক বা না থাকুক, রূপকথা তথা Marchen-এর সঙ্গে Fair-Tale-এর পার্থক্য অন্যত্র। এই পার্থক্যকে খুঁজতে গেলে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি প্রয়োজন। দুইয়ের মধ্যেই রাজা-মন্ত্রী পাত্র-মিত্র-কোটাল-অমাত্য-রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাণী সবই পাওয়া যায় ঠিকই; কিন্তু Marchen-এ যেমন সাধারণ মানুষের জীবনচর্যাই বেশি প্রতিফলিত, তেমনি বাংলা রূপকথায় রাজা-রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যাদের জীবন একেবারে মাটির সাধারণ মানুষদের কাছাকাছি। পক্ষান্তরে Fairy-Taleএর রাজা-মন্ত্রী-অমাত্যদের জীবন সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধময় ও বিলাস-বৈভবে পরিপূর্ণ। বাংলা রূপকথার রাজা-রাণীদের যে জীবন আমরা পাই, সেখানে সংসারের যাবতীয় কাজই তারা নিজেরা করেন–সে মাছ কোটা, বাটনা বাটা, জল তোলা, রান্না করার থেকে শুরু করে স্বামী-পুত্রকে খেতে দেওয়া পর্যন্ত। সেই জীবন এতই সাধারণ সুলভ যে একমাত্র পুত্র জীবিকার্জনের কোনো উপায় না করলে বাবা তাকে শাসন করেন এবং মাকে আদেশ করেন ভাতের পাতে ছাই দিতে; সে জীবন এতই কিনা অনাড়ম্বর যে, দাসী যে ব্রত করে, রাণীও সেই ব্রত করে এবং নিজের ব্রতের যোগাড় তাকে নিজেকেই করতে হয়; সে জীবনে নিশ্চিন্ততার এতই অভাব যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতিজ্ঞা করতে হয় পরদিন ভোরবেলা যার মুখ দেখবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। অর্থাৎ কিনা সাধারণের তুলনায় তাঁদের সুখের আয়োজন আদৌ বেশি নয়, অথচ তারা রাজা বা রাণী। সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে দেখলে বলা চলে যে আদিম সাম্যাবস্থা নির্ভর কৌম বা tribal সমাজ উচ্চতর শ্রেণীভিত্তিক স্তরে পৌছবার আগের পর্যায় বাংলা রূপকথাগুলির মধ্যে লভ্য। এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলা রূপকথার একেবারেই নিজস্ব।

এগুলি ছাড়াও বাংলা রূপকথার আরো এমন কিছু অনন্যতা আছে, যেগুলি অন্যত্র পাওয়া যায় না। রূপকথায় দম্পতিরা প্রায়ই হয় নিঃসন্তান, নতুবা অপুত্রক থাকেন এবং এই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাদের সুখ-দুঃখ আবর্তিত। ফলে অলৌকিক উপায়ে সন্তানপ্রাপ্তির ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারা হয় যাদুশক্তিসম্পন্ন ফলের হদিশ দেন, কখনো বা বিশেষ কোনো শিকড়-বাটা খাবার কথা বলেন। যেমন বুদ্ধু-ভূতুম এর গল্প অধিকাংশ সন্তানহীনা রমণীর সন্তানকে নিয়ে একটি না একটি নিষেধাজ্ঞা থাকে এবং অব্যবহিতভাবে সেটি লঙ্ঘিত হয়। যেমন একটি বাংলা রূপকথা পাই, যেখানে বলা হচ্ছে বারো বছরের আগে সন্তান যদি পিতার মুখ দেখে তবে পিতা অন্ধ হয়ে যাবে। এবং কাহিনীসূত্রে সময় পূর্ণ হবার ঠিক একদিন আগে নিষেধাজ্ঞাটি লঙ্ঘিত হয়। আবার অলৌকিক শক্তির সহায়তায় এই ক্ষতিটি পূরণ হয়ে যায়।

বাংলা রূপকথার অনন্যতা সৃষ্টি হয়েছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বা শুক-সারী–এই পাখি

দম্পতির চরিত্রসৃষ্টিতে। এরা চেহারায় না হলেও স্বভাবে প্রায় মানুষ এবং এদের ক্ষমতা এতখানি যে এরা রাজপুত্রকে তার উদ্দিষ্টে পৌছতে এমন সাহায্য করে, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংস্কৃত নাটক/কাব্যতে সূত্রধরের যে ভূমিকা, বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় কোনো প্রাণীর হদিস আমরা বাস্তব জগতে পাই না। কথকের বর্ণনায় পাই যে মানুষের রক্ত দিয়ে এদের চোখ ফোটাতে হয়, মানুষের মতই এরা সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' সংগ্রহে ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমীর একটি কল্পিত চিত্র দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই রকমই একটি চরিত্র হল পক্ষীরাজ ঘোড়া। বাংলা রূপকথার অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষেত্রে এই চরিত্র গুলির জুড়ি নেই। এই ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমী বা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত তেপান্তরের মাঠ, সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পার-ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিষ বাংলা রূপকথার একেবারে একান্তভাবে নিজস্ব বস্তু।

বাংলা রূপকথার বিষয়বস্তুগত আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে এর মধ্যে ভবিষ্যত কথন একটি বিশেষ স্থান পেয়ে থাকে। অধিকাংশ বাংলা রূপকথাতে আমরা দেখি যে সন্তান জন্মানোর সঙেগ সঙেগ জ্যোতিষকে দিয়ে ভাগ্য-গণনা করা হচ্ছে। কোথাও বা দেখি ব্যাঙগমা দম্পতি বলে দিচ্ছেন কিভাবে সামনের দিন গুলোতে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটবে এবং কিভাবে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এবং সত্যি সত্যিই পর্যায়ক্রমে সেই ঘটনাই ঘটছে। এর পাশাপাশি রয়েছে যাদুবিদ্যার চর্চা; মাথারচুলে শিকড় বেঁধে মানুষকে পাখিতে পরিণত করা বা মন্ত্রপড়ে কোনো পুরুষমানুষকে ভেড়াতে পরিণত করা ইত্যাদি। অর্থাৎ যাদুবিদ্যার চর্চা বাংলা রূপকথাতে একটি নিজস্ব স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বাংলা রূপকথার সমধর্মী অন্যান্য কাহিনীগুলিতে যে এটি নেই, তা নয়-তবে বাংলার ক্ষেত্রে সেগুলি কাহিনীসূত্রে যতখানি অপরিহার্য, অন্যগুলির ক্ষেত্রে তা নয়।

বাংলার রূপকথায় মানুষ, পশু, রাক্ষস, এমনকি ফুল-ফল ইত্যাদিও অনেক ক্ষেত্রে যখন-তখন পারস্পরিকভাবে রূপ বদল করে। বাংলা রূপকথার এই বিশিষ্টতাটির দিকে ড: হাইনৎস্ মোডে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই বক্তব্য তিনি রেখেছেন তাঁর 'Some Peculiarities of Bengal Folk-Tales'নিবন্ধে। ['Folk-Lore', Calcutta, Nov 1965] যথাক্রমে D40—45, D100—199 এবং D300—D399 ইত্যাদি ধরনের মোটিফ উপরোক্ত পরিবর্তনগুলিতে সূচক হিসেবে বিশ্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হলেও বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সর্বদাই কাহিনীর পরিণতির প্রধান মোড় হিসেবে গণ্য হয়, বা Marchen, Bylina, Fairy-Tale, Sagen প্রভৃতি সমধর্মী কাহিনীগুলির মধ্যে অপ্রাপ্য।

সামাজিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা না বললে বাংলা রূপকথার নিজস্বতার একটি দিক না বলা থেকে যাবে।-বাংলা রূপকথার মধ্যে কখনও কোথাও যৌনতামূলক উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র আমরা পাই না। নারী অপহরণের চিত্র রয়েছে একাধিক। কিন্তু কোথাও নারীর সতীত্বকে লাঞ্ছনা করার চিত্র নেই। যদিও একথা অনস্বীকার্য নয় যে রূপকথার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশ্বজনীন পরিপ্রেক্ষিতে অনেক গবেষকই মানুষের অবচেতন যৌন চেতনার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। রূপকথার বিভিন্ন বিষয়কে তারা ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে যৌন প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন। এই সূত্রে বাংলা রূপকথা-ভাণ্ডারের 'পাতাল কন্যা মণিমালা' গল্পটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেখানে যৌনতা সম্পর্কিত প্রাচীন মানুষের চিন্তাধারা খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে; তবে সেগুলি বিশ্লেষণমূলক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণত যৌনতামূলক দুরাচার কিন্তু বাংলা রূপকথাগুলির কোথাও নজরে পড়ে না। পুরুষের ছদ্মবেশ পরিহিত রাজকন্যার সঙেগ অপর এক রাজকন্যার বিবাহ প্রসঙেগ দেখি উভয়ের মাঝখানে তরোয়াল রেখে নিশিযাপন; আবার যেখানে অপরের প্রণয়সক্তা বাগদত্তাকে ধরে আনা হয়েছে, সেখানে রাজকন্যার ব্রতের ছলনাকেও যথেষ্ট মর্যাদার সঙেগ রক্ষা করা হয়েছে। কাজে কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে এক পুরুষের বহু স্ত্রী থাকাটা ছিল সামাজিক রীতিসিদ্ধ; পরনারী আসক্তির তাই শোভনতার সীমানাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

এই আলোচনার থেকে মনে হতে পারে যে, হয়ত বাংলা রূপকথা অন্যান্য রূপকথার থেকে একেবারেই আলাদা-স্বতন্ত্র কোনো ধারা। বস্তুতপক্ষে তা নয়; লোককথার বহুবিচিত্র টাইপ (Type) এবং মোটিফ (Mofit) অন্যসব ধারার রূপকথার মত বাংলা রূপকথাতেও প্রচুরায়তভাবে আমরা পাই। আর সেইজন্যই বাংলা রূপকথার সঙেগ ইংরেজী Fairy Tale, জার্মান Marchen ফিনল্যান্ডের Sager আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লোককাহিনী, রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী গল্পধারার আশ্চর্য সব সাদৃশ্য দেখা যায়। বাংলা রূপকথার 'দেড় আঙুলে'র গল্প পড়ে তাই চট করে Tom Thurnb'-এর কথা মনে পড়ে যায়, 'সুখু-দুখু'র গল্প মনে পড়ায় 'সিনড্রারেলাকে', 'স্লিপিং বিউটি' আর 'ঘুমন্ত পুরী'-সে তো প্রায় একই গল্প। -এবং এই তালিকা অফুরন্ত।

□৭১১ পৃষ্ঠার পর

আচ্ছাদিত। ভোরের কিছুক্ষণ পূর্বে আমি স্বপ্নে একজন মহাপুরুষকে ব্যাঘ্রারূঢ় দেখলাম। তাঁকে দেখতে খুব সুন্দর। তাঁর দীর্ঘাঙগ দেহ এবং হস্তদ্বয়ের মধ্যে আছে ধনুর্বাণ। তিনি আমায় বললেন তিনিই হচ্ছেন দক্ষিণ রায় আরও বললেন 'পাঁচালি রচনা করে আমার গুণগান কর'। আঠারটি ভাটির নিম্নতম জেলাগুলিতে যেন তা প্রচারিত হয়। পূর্বে মাধবাচার্য আমার কবিতা রচনা করেছিলেন তা আমার পছন্দসই হয়নি তাতে আমার লীলাক্ষেত্রের কোন উল্লেখ ছিল না সেটি যেন বণিকের দাবাখেলার মত। তার ভাষাও ছিল অশ্লীল। আমার স্তুতি যে কবিতা রচিত হয়েছে সে সম্বন্ধে গায়েনদের কোন জ্ঞান ছিল না। সুতরাং তাঁর যেন জাগরণের পালাগান করছেন তা নিয়ে মৌলা ও মলাঙিগণ পরম তৃপ্তির সঙেগ উপভোগ করতেন। দক্ষিণরায় কবিকে বিশেষ শক্তি দান করে অন্তর্ধান হলেন। বাংলা লোক কবিতায় ইহা হল অতুলনীয়। তিনি বললেন যদি দেখা যায় আমার কবিতার প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা আছে তাহলে তার বংশকে ব্যাঘ্রের সাহায্যে ধ্বংস করবে। কবি নিজেকে শিশুবৎ মনে করে দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর দেবতা তাঁর স্তুতি নিজগান করে বললেন তা কবি শুনলেন। এতে কবি কৃষ্ণরামকে পাঁচালি রচনায় শক্তি যোগাল দক্ষিণরায়ের পাদপদ্মে ধ্যানস্থ হয়ে। কবিতায় কাব্য রচনার তারিখ উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৬০৮ শকাব্দ বা ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে রায়মঙগল রচনা করেন। কৃষ্ণরাম কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবতী দাস। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, কৃষ্ণরাম দাসের আদিনিবাস ছিল কলিকাতার সন্নিকটে বেলঘরিয়ার নিমতায়। তাঁর জীবিতকালে কবির সুখ্যাতি চারিদিকে বিশেষ প্রচারিত হয়। বর্তমানে কবির গৃহস্থানের কোন চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরামের কোন বংশধরের সন্ধান কাহারও গোচরীভূত নয়। তিনি যে একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তা তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি বহু প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবিতার সহজ ও সাবলীল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

নিম্ন বাংলায় স্থানীয় প্রসিদ্ধ দেবতা দক্ষিণরায়ের উদ্দেশে তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন সেজন্য অন্য কোন স্থানে তাহা পরিব্যপ্ত হয়নি। হিন্দুপুরাণে বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে কোথাও ব্যাঘ্রদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না সেজন্য এই দেবতার চিন্তাধারা কবির নিজস্ব। উত্তর বাংলায় ব্যাঘ্রদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর নাম সোনা রায়। তাঁর সম্বন্ধে বহু গাথাও রচিত হয়েছিল। পূর্ববাংলায় ময়মনসিং জেলায় একটি প্রচলিত গাথা পাওয়া যায় 'ব্যাঘাইর রয়াত' নামে।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও পঞ্চায়েতীরাজ

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী

গণতন্ত্রের অন্যতম শর্তই হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো সংসদীয় গণতান্ত্রিক হলেও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে কেন্দ্রীকতা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৫০ এর দশকে রাজ্যগুলি যেটুকু অধিকার ভোগ করতো আজ তাও বহুলাংশে সংকুচিত। ফলে রাজ্য সরকারগুলি রাজ্যবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি বাস্তবায়ণের প্রশ্নে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ। যেহেতু ভারতবর্ষের আশি ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে সেইহেতু সমাজের বৃহত্তম অংশের উন্নতিই দেশের উন্নতি সূচিত করে। গ্রাম বলতে মাটি ও মানুষ, প্রাচীন কালের মণীষীরা বুঝেছিলেন, এই মাটিই অন্নপ্রসবিনী, সেই জন্যই মৃত্তিকাকে মাতৃ আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

গ্রাম সমাজই মানব সমাজকে ধারণ করে আছে। তাই এই গ্রাম-মাটিই সভ্যতা বিকাশের আদিকারণ। অথচ যুগ যুগ ধরে এই গ্রাম ও গ্রামের মানুষ উপেক্ষিত, অবহেলিত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই কথা সর্বাংশে সত্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা যেতে পারেঃ "আমার ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকেদেরই নয়। আমি স্পষ্টই জানি নীচের লোক যত নামছে ভারতবর্ষই নামছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) নবম খন্ড পৃঃ ৪৬৭] আমরা এটাকে ইতিহাসের পরিহাস বলেই ক্ষান্ত হই কিন্তু আসলে তা হল শাসকশ্রেণীর নগ্ন অবিচার আর অত্যাচার। আরও পরিতাপের বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর চল্লিশ বছর পরেও গ্রামীণ মানুষ ও গ্রাম, মূলত উপেক্ষিত হয়েই রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনাও অবিচারের ফলে। ধনবাদী পরিকল্পনাগুলির সুফল মুষ্টিমেয় মানুষের করতলগত হচ্ছে। তাই গ্রামজীবনের পশ্চাদপদতা পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগর বিকাশের যেমন প্রয়োজন আছে, ততোধিক প্রয়োজন আছে গ্রামের উন্নতি, কারণ গ্রাম না বাঁচলে নগর শুকিয়ে যাবে, সভ্যতার উন্নতি হবে কঙ্কালের কষ্ট হাসি। তাই দেশ ও জাতির উন্নতি স্বয়ংভরতা গ্রামকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার ও সম্পদ সৃষ্টি দেশ ও জাতির অগ্রগতির মানদন্ড।"

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বনিয়াদ সুদৃঢ় করতে হলে গ্রামস্তর থেকে উর্ধ্বতম স্তর পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা দরকার। সেই সঙ্গে নিম্নস্তরে ব্যাপক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক সমন্বয় ঘটান একান্ত কাম্য। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণই মেহনতী মানুষকে শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়তা দেবে।

—অশোক মেহতা কমিটির রিপোর্টে এই কথাই বলা হয়েছেঃ

"My faith in democratic decentralisation from the fact that it helps the working people in their day to day struggle against their opppressors and exploiters." (E.M.S Namboodripad, Member, Ashoke Mehta Committee on Panchayate)

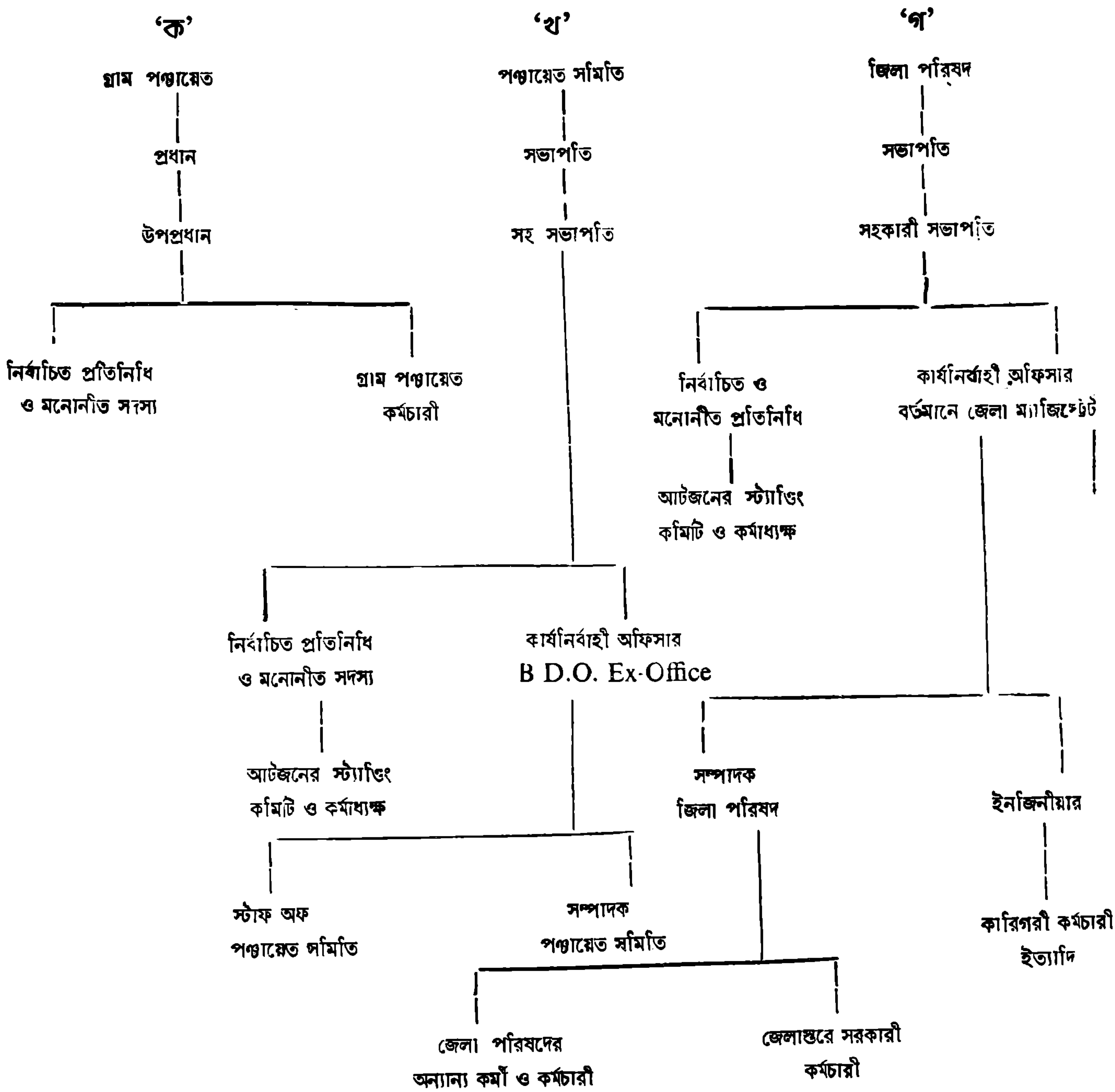
তাই গ্রামীণ জীবন ধারার মান উন্নয়নের প্রশ্নে গণমুখী বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত জরুরী। আজ ১৯৮৬ সালের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে গ্রামীণ চিত্ররূপ দেখছি ১৯৭৫-৭৬ সালে এই বাংলায় তা ছিল না। গ্রামীণ জীবনে আজ বেশ খানিকটা চরিত্রগত গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে এই স্বল্পকালের মধ্যে। এই পরিবর্তন হঠাৎ বা আপনা-আপনি ঘটেনি। বলা যেতে পারে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ১৯৭৭ সালের পর পঞ্চায়েতীরাজের রাহুমুক্তির ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। গ্রামভিত্তিক ভারতবর্ষে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কও কার্যাবলীর সমন্বয়সাধনের একমাত্র পথ হল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা। এ রাজ্যে সরকারের সঙ্গে গ্রামের মানুষের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান ত্রিস্তর পঞ্চায়েতীরাজ কাঠামো মূল তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (১) **শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।** দীর্ঘকাল ধরে ন্যূনতম গ্রামীণ পরিকল্পনার কাজ ছিল কেন্দ্রীভূত, আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল, মোড়লরূপী জেলার বিত্তবান মানুষের কুক্ষীগত ছিল পঞ্চায়েত। বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, তারতম্য বিচারের কোন সুযোগ ছিল না। বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা গ্রামেরই মানুষ; অঞ্চলের সমস্যা ও জটিলতা তাদের অজানা নয়। ৫৬৩৯২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই সব কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। (২) **গ্রামীণ ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ।** এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষ প্রতিক্ষেত্রে তাদের মতামত জানাবার সুযোগ পান। এ অধিকার গ্রামের মানুষের আগে ছিল না। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যার নেতৃত্ব এবং সহযোগিতা প্রশাসনিক কাজকে সহজ করে তুলেছে। (৩) **গণশ্রম ও স্বনির্ভরতা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।** গ্রামীণ পরিকল্পনা ও কর্মোদ্যোগে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক স্বয়ংভর গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি পরিকল্পনা রূপায়ণে গ্রামীণ শ্রম, গ্রামীণ উপাদানগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হচ্ছে এই কাজে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার সংসদীয় গণতন্ত্রে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের অধিকার সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত নয়। ভারত সরকার সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি আজও বাস্তবায়িত করেনি; কেন্দ্রের অনুসৃত নীতিও এর পরিপন্থী। সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পূর্ণ বাস্তবায়ন করলে জীবন ধারণের মান কিছুটা উন্নত করা যায়। আজ গ্রামের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার সচেতনতা অনেকটাই লাভ করেছে বলতে গেলে পঞ্চায়েতী রাজের কল্যাণেই। গ্রাম স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত পঞ্চায়েতী রাজের পরিকাঠামো জনগণের প্রত্যক্ষ একটি মিনি সরকারের সংস্করণ বলা যেতে পারে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও সরকারি প্রশাসনের কাজের সমন্বয়সাধন পঞ্চায়েতী-রাজের কাঠামোর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। আজ পঞ্চায়েত কথাটি বহুল প্রচলিত কিন্তু

বিকেন্দ্রীকরণের স্বরূপ কেমনভাবে পঞ্চায়েতী কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত আমরা অধিকাংশ মানুষই তা জানি না। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বলতে কি বোঝায় শহরের অধিকাংশ মানুষই জানে না। এ সম্পর্কে গ্রামের অনেক শিক্ষিত মানুষেরও জানা নেই। নিম্নবর্ণিত ছকটিতে তা দেখান হলঃ

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও তাদের প্রাশাসনিক কাঠামো



(১) গ্রামীণ কর্মসূচী রূপায়ণের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর। প্রাথমিক কাজের মধ্যে রয়েছে (ক) জনস্বার্থ সংরক্ষণ (খ) মহামারী প্রতিরোধ (গ) পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ (ঘ) সাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করিণী সংরক্ষণ (ঙ) পানীয় জল সরবরাহ (চ) পশুচারণ ভূমি; শ্মশান ঘাট, কবরখানা সংরক্ষণ (ছ) গ্রাম উন্নয়নের জন্য শ্রমদান সংগঠন (জ) পঞ্চায়েত তহবিল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ (ঝ) কর সংগ্রহ (ঞ) ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ইত্যাদি। এছাড়াও রাজ্য সরকার প্রাথমিক, সামাজিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, বৃক্ষ রোপণং সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন, ভূমি সংস্কারের সহায়তাদান, চাষের প্রয়োজনীয় সার, যন্ত্রপাতি বন্টনে সহায়তা করা, কুটির শিল্পের প্রসার ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে। গ্রাম বাংলার

উত্তরণের পথে পঞ্চায়েত নেতৃত্বই প্রাথমিক শক্তি ও সম্পদ

(২)পঞ্চায়েত সমিতির কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি স্থায়ী কয়েকটি কমিটি স্থায়ী কয়েকটি গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে (ক) অর্থ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি; কর্মধ্যক্ষ পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি; (খ) শিক্ষা স্থায়ী কমিটি; (গ) জনস্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটি; (ঘ) পূর্তকার্য স্থায়ী কমিটি; (ঙ) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী কমিটি; (চ) ক্ষুদ্র শিল্প; ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী কমিটি।

পঞ্চায়েত সমিতি ব্লকএলাকার এ রকম উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই সমিতি কৃষি, কুটির শিল্প, সমবায়-সেচ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, রাস্তাঘাটের উন্নতি, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অর্থ সাহায্য করতে পারে। বন্যা, খরা প্রভৃতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অর্থ সাহায্য করতে পারে। বন্যা, খরা প্রভৃতি সংকটকালে ত্রাণ ব্যবস্থার সংগঠনও পঞ্চায়েত সমিতির কর্তব্য। পঞ্চায়েত সমিতির বাজেটে জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার ব্লক অফিসের বিবর্তন হয়েছে পঞ্চায়েত অফিসে। বি.ডিও হয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর পঞ্চায়েতের সঙ্গে হয়েছে। অভিজ্ঞ গ্রাম সেবকগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগী শক্তি হিসাবে যুক্ত হয়েছেন।

(৩) জেলা পরিষদের কাজ পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গে জেলা শাসককে কার্যনির্বাহক হিসাবে যুক্ত করেছেন। রাজ্য সরকার একজন কর্মসচিব নিয়োগ করে থাকে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার কয়েকটি স্থায়ী কমিটি আছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে যে সকল স্থায়ী কমিটি আছে, পরিষদেও অনুরূপ কমিটি বর্তমান। তারাই জেলার সরকারী পরিকল্পনাগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়ণের দায়িত্ব পালন করে। বিদ্যালয়-পাঠাগার প্রভৃতি জনকল্যাণ সংস্থাকে অর্থসাহায্য দান, হাট-বাজার সংরক্ষণ, মহামারী, বন্যা, খরা প্রতিরোধে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েতসমিতিকে আর্থিক সাহায্য দান পঞ্চায়েত সমিতির বাজেটে পরীক্ষা ও অনুমোদন ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সমন্বয়সাধন ইত্যাদি কাজ জেলা পরিষদ করে থাকে।

বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা' বিষয়ে আলোচনা চক্রের উদ্বোধন

৭০৫ পৃষ্ঠার পর

ভাষায় রচনার পরে ইংরিজিতে রচনা প্রকাশ করাই সমীচিন। ডঃ দত্ত বাংলা আকাদেমির কাছে একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব জানিয়ে ইংরাজি ভাষায় লিখিত গবেষণার প্রাঞ্জল অনুবাদ তাতে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশের বিদগ্ধ প্রতিনিধি ডঃ রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশে সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন, উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলাদেশ এখন কঠিন সংকটের মুখোমুখি। কারণ উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার একান্ত অভাব থাকায় ইংরিজিতে গ্রন্থ পড়ে ছাত্রছাত্রীদের বাংলায় অথবা ইংরিজিতে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এই কারণে এই আলোচনা চক্রের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চার বিষয়ে তথ্য ও নির্দেশ জানার জন্য তিনি খুবই আগ্রহী। তিনি বলেন আমরা যেখান থেকে যা পারছি তা গ্রহণ করছি। দেশকালের কোন কোন সীমারেখা নেই। বাংলা ভাষায় গ্রন্থ, রচনার কাজ অবশ্যই করতে হবে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে যদি আমরা বাংলা ভাষায় না নিতে পারি তবে মাতৃভাষায় শিক্ষার পরিণাম বিপর্যয় এনে দেবে এবং আমরা ভাসমান এক ভাষা সংকটে পড়ে যাবে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেন, বাংলা ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুধ্যান ও অধ্যয়নের প্রয়োজন। তিনি বলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ও অন্যান্য বহু দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও অধ্যয়ন মাতৃভাষায় হয়। আমাদের দেশে ইংরিজির বাইরে কাজ বেশি হয়নি অথচ কত অনুবাদযোগ্য গ্রন্থই না রয়ে গেছে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পক্ষে ডঃ পবিত্র সরকার জানান পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নিজস্ব উদ্যোগে আলোচনাচক্র এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্য জানিয়ে বলেন, বাংলা আকাদেমি একটি পত্রিকা প্রকাশেও উদ্যোগী যেখানে বিশেষজ্ঞরা বাংলা ভাষায় রচনার সুযোগ পাবেন।

অনুষ্ঠানান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান

৯, ১০, ও ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ তিনদিন রাজনগর ব্লকের তাঁতিপাড়া ও খয়রাশোল ব্লকের আনন্দনগর ও ডেমুরটিটা গ্রামে সিউড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে "সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান" হয়ে গেল। এই অভিযানে আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি, ৮৭ তাঁতিপাড়া হরিজন ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসিতাংশু চক্রবর্তী, (প্রধান শিক্ষক, তাঁতিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়)। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত আলোচনা চক্রে শ্রীচক্রবর্তী তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গাছ লাগানোর পক্ষে বলেন, "গাছই মানুষকে মৃত্যুর অভিশাপ হতে রক্ষা করে চলেছে" তাই তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে গাছ লাগাতে ও গাছ বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করেন। প্রায় দুই শতাধিক মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি, ৮৭ খয়রাশোল ব্লকের আনন্দনগর গ্রামের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খড়বোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবিলাল মন্ডল। শ্রীরবিলাল মন্ডল বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি বিষয় আলোচনা করেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে রূপুরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শ্রীমনি গোস্বামী বলেন—ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সুষ্ঠ পরিনতি লাভ করার ফলেই আজ গ্রামে বাংলার উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে। পঞ্চায়েত সম্পর্কিত প্রদর্শনী প্রায় তিন শতাধিক মানুষ দেখেন ও প্রশংসা করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি, ৮৭- ডেমুরটিটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীআব্দুল গফ্ফর, ডেমুরটিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শ্রীমনি গোস্বামী এখানকার আলোচনা সভায় বলেন, "গ্রামের পুরোনো মোড়লী প্রথার নবরূপায়ণ এই পঞ্চায়েত"। শ্রীআব্দুল গফ্ফর শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন বামফ্রন্ট সরকারই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় নব যুগের সূচনা করেছে। এই সরকার শিক্ষকদের বেতন নিয়মিত ও সুদৃঢ় করেছে।

আরাক্‌নিদা

শ্রীপুষ্পেন্দু লাহিড়ী

নাম দেখে আমিও ঘাবড়েছিলাম। কীটপতঙ্গের ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে কতকগুলি সন্ধিপদী গোষ্ঠীর অমেরুদন্ডী প্রাণীর সন্ধান পেলাম। যারা পোকামাকড়ের "মাকড়" অংশে পড়ে। যেমন,–মাকড়সা, কাঁকড়া বিছে, এঁটেল পোকা ইত্যাদি। গোত্রের দিক থেকে এরা কেউই ইনসেক্টা নয়, এদের গোত্র আরাক্‌নিদা।

এদের গোত্রের নামকরণ নিয়ে গ্রীক পুরাণে একটি গল্প আছে। কুমারী কন্যা আরাক্‌নি একদা একটি বুননের প্রতিযোগিতায় গ্রীক দেবী এথেনাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে, তাঁকে পরাজিত করে। গ্রীক দেবী সেই পরাজয় সহজ মনে গ্রহণ করতে না পেরে, আরাক্‌নিকে অভিশাপ দেন, সে চিরজীবন শুধু বুনেই চলবে এবং এথেনা আরাক্‌নিকে মাকড়সায় রূপান্তরিত করেন। গ্রীক পুরাণ মতে এই হলো মাকড়সার জন্মকাহিনী।

আরাক্‌নিদা গোত্রের মধ্যে মাকড়সাই সর্বত্র দেখা যায়, অর্থাৎ এরাই আমাদের বিশেষ পরিচিত। মাকড়সা কার্বানিফেরাস যুগ (২৮ কোটি বছর পূর্ব) থেকেই বর্তমান। এদের প্রজাতির সংখ্যা অন্তত বিশ হাজার। এরা প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলের প্রাণী। শারীরিক গঠনের জন্যেই মাকড়সা একাধারে জুগুপ্সা ও কৌতূহল উদ্রেক করে। মাকড়সার আটটি পায়ের প্রথম জোড়াতে থাকে বিষনখ। এদের শিরোবক্ষ একাকার এবং পাতলা চামড়া ঢাকা; উপাঙ্গহীন পেছনের অংশই হলো উদর। উদরের পশ্চাদ্‌ভাগে "স্পিনারেট" নামক অঙ্গের সাহায্যে আপন গ্রন্থিনিঃসৃত প্রোটীন জাতীয় রসে জাল বোনে। ঐ রস বাতাসের সংস্পর্শে এসে কঠিন সুতোয় রূপান্তরিত হয়। মাকড়সার জাল দেখলে তখনি আরাক্‌নির কথা মনে পড়ে যাবে। চমৎকার সূক্ষ্ম জ্যামিতিক পরিমাপের সেই জাল দেখলে কি মনে হবে যে, এটি মাকড়সার শিকার ধরার ফাঁদ? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জালের মালিক এক কোণে বসে আছে বক ধার্মিকের মতো। অন্যমনস্ক পতঙ্গাদি যখনই জালে ধরা পড়ছে, তখনই জালের মাংসাশী মালিক ছুটে এসে বিষনখের সাহায্যে শিকারকে নিষ্ক্রিয় করে তার রক্তরস পান করছে। ডাকটিকিটের ছবিতে এদের নিরীহ বলে মনে হলেও, কোনো কোনো মাকড়সার বিষ মানুষকেও বেশ জ্বালাতন করতে পারে।



মাকড়সা যে শুধু গাছের ডালেই বাস করে, তাই নয়; এরা মাঠেঘাটেও গর্ত করে বাসা বাঁধে। অবশ্য সর্বত্রই মাকড়সা স্বাধীনজীবী ও এককভাবে বসবাসকারী। স্ত্রী-মাকড়সা সাধারণভাবে পুরুষ-মাকড়সা অপেক্ষা চেহারায় বড় হয়। প্রজননকালের আগে পুরুষকে প্রণয় প্রার্থনা করে বেশ কিছুক্ষণ নাচ দেখাতে হয় এবং স্ত্রীর প্রত্যয় উৎপাদন করতে না পারলে, স্ত্রী-মাকড়সা তৎক্ষণাৎ পুরুষটিকে আক্রমণ করে উদরসাৎ করে ফেলতে পারে। এমন কি মিলনের শেষে স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষটিকে তাড়িয়ে দেয় এবং আশ্চর্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষটিকে পর্যুদস্ত করে ভক্ষণ করে।

মাকড়সার ডিম ফুটে অপরিণত বাচ্চা বেরিয়ে আসতে প্রায় ১৫ দিন কেটে যায়। তারপর সাধারণত বছর খানেক বেঁচে থাকে। এরা বিশেষভাবে পতঙ্গভূক বলে, অপকারী পতঙ্গদলের সংখ্যাকে কমিয়ে রেখে পরোক্ষে আমাদের উপকারই করে। সেকথা কি আমরা কেউ ভেবে দেখেছি?

মাকড়সার শত্রু সংখ্যাও কিছু কম নয়। তাদের মধ্যে পড়ে ছোট ছোট কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখী, টিকটিকি, গিরগিটি, ব্যাঙ প্রভৃতি। এছাড়াও পিঁপড়ে, গুবরে জাতীয় পোকা, বিছে ইত্যাদিও এদের শত্রু। বোলতার কিছু প্রজাতি জীবন্ত মাকড়সাকে হুল ফুটিয়ে অসাড় করে, তার দেহের ভেতর ডিম পাড়ে; সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে জীবন্ত মাকড়সাকে কুরে কুরে খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। উপরন্তু, মাকড়সার নানা প্রজাতি নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে দুর্বলকে ভক্ষণ করে ফেলে।

কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রকাশিত মাকড়সার ডাকটিকিট দেখলেই কেমন যেন আমার দুঃখ হয়। কোপনস্বভাবা দেবী এথেনার কারণহীন অভিশাপে ফুলের মতো কুমারী কন্যা আরাক্‌নির কী কুৎসিত চেহারাই না দাঁড়িয়েছে! গ্রীক দেবী এথেনা কি আমাদের দেবী মনসার সহোদরা ভগিনী!

এইসব নানা কিসিমের ছোটবড় মাকড়সা যখন আমাদের ঘরে বারান্দায় উঠোনে শিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তখনই কেমন যেন গা সির্‌সির্ করে। কিন্তু যখন এদেরই আর এক জাতি কাঁকড়াবিছে দেখা যায়, তখন ভয়ে শরীর সিঁটিয়ে যায়। কারণ এদের গরল অতি



ভয়ানক। সাপের বিষের মতোই কখনো কখনো তা প্রাণঘাতী। যখন প্রকৃতির রাজ্য ছেড়ে এরা ঢুকে পড়ে মানুষের বাসগৃহে–গুটিসুটি মেরে ঢুকে পড়ে বিছানায়, আসবাবপত্রে কিংবা জুতোর অন্ধকারে–তখনই আশঙ্কা। কারণ রাতের আঁধারেই এদের চলাফেরা।

কাঁকড়াবিছেও আরাক্নিদা গোত্রের। এদের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৬৫০ টি। পৃথিবীতে এদের আবির্ভাব অন্তত ৩৪ কোটি বছর আগে ঘটেছিল। কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিম দিন থেকে কাঁকড়াবিছের চেহারা চরিত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। কাঁকড়াবিছের দেহটি চিংড়ির মতো কালচে–বাদামী খোলায় আবৃত। মাকড়সার ন্যায় শিরোবক্ষ ও উদর, এই দুই ভাগে বিভক্ত। দৈর্ঘে কখনো ৮ ইঞ্চি অবধি হয়। মুখের কাছে একজোড়া ছোট ও একজোড়া বড় সাঁড়াশির মতো দাঁড়া আছে; যেগুলি থাকার ফলে ধরতে এবং কাটতে পারে। পাঁচটি খন্ডে গঠিত সংকীর্ণ লেজের সঙ্গে রয়েছে হুল এবং দুটি বিষগ্রন্থি-নালী হুলের সঙ্গে যুক্ত।

কাঁকড়াবিছে রাত্রেই খাবারের সন্ধানে বের হয়। তাদের শিকার প্রায়শই পতঙ্গ ও মাকড়সাতেই সীমাবদ্ধ। এরা শিকার ধরলে প্রথমেই দাঁড়া দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে বা পিষে ফেলে। বাধা পেলে তবেই এরা হুল ফোটায়। বধ্য জীবটিকে তখন ধীরে ধীরে ভক্ষণ শুরু করে।

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কাঁকড়াবিছে খাদ্য ও জল ছাড়া বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। মরুভূমি যান উটের সঙ্গে এদের এই বিষয়ে বেশ মিল। কারণ কাঁকড়াবিছে প্রধানত ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রাণী এবং মরুভূমিতেও এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

স্বভাবে এরা নিশাচর এবং ফাটল, গর্ত, আবর্জনার স্তূপ, ছায়াবৃত স্থান আর গুমোট জলো আবহাওয়া ওদের বিশেষ পছন্দের। মাকড়সার মতোই এই ক্ষুদে শমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে; ক্ষুদ্র আবেষ্টনীতে এরা অপরের সান্নিধ্য ও আধিপত্য সহ্য করতে পারে না এবং প্রায়ই জীবনপণ লড়াই করে।

কাঁকড়াবিছের প্রণয়কালীন নৃত্য বিখ্যাত। (সেই বিস্ময়কর নৃত্যের পরিচয় চিত্রবদ্ধ হয়ে আছে ওয়াল্ট ডিজনীর খ্যাতনামা চলচ্চিত্র "লিভিং ডেজার্ট-"এ)। কিন্তু তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়োগান্ত দৃশ্য। মিলনের অব্যবহিত পরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমিকা তার প্রণয়ীকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে উদরসাৎ করে। এরা ডিমের বদলে, কয়েক সপ্তাহ ধরে সরাসরি ২০ থেকে ৫০ টি বাচ্চার জন্ম দেয়। সদ্যোজাত শাবকগুলি পূর্ণাবয়ব কাঁকড়াবিছের মতোই দেখতে, কিন্তু ক্ষুদ্র। প্রথম খোলস ত্যাগ



না করা পর্যন্ত মা কাঁকড়াবিছে তাদের বহন করে বেড়ায়। তারপর শুরু হয় তাদের একক জীবন।

কোনো কোনো কাঁকড়াবিছের বিষ অত্যন্ত মারাত্মক। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। প্রথমে দংশনের স্থানটি ফুলে ওঠে। নাক মুখ দিয়ে জল গড়ায়। গা গুলিয়ে উঠে বমি আসে। কখনো দম বন্ধ হয়ে আসে। হৃদ্‌স্পন্দনের মাত্রা বাড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে রুগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুল ফোটানোর ৬ থেকে ১০ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটা সম্ভব।

এইসব ভয়ানক প্রাণীদেরও শত্রু আছে। গোসাপ জাতীয় সরীসৃপ, আফ্রিকার বেবুন প্রভৃতি প্রাণী কাঁকড়াবিছে খায়। এমনিতেই আফ্রিকার কাঁকড়াবিছে বিখ্যাত, কি দৈর্ঘে কি গরলের অহমিকায়; বিশেষ করে আফ্রিকার আলজিরিয়া রাষ্ট্র কাঁকড়াবিছের জন্যে প্রসিদ্ধ। সম্ভবত সেই কারণে আজও আলজিরিয়ার কিছু আদিবাসী কাঁকড়াবিছে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আশ্চর্য লাগলেও ব্যাপারটি সত্যি! মাংসাশী কাঁকড়াবিছের খোলস ছাড়ালেই এবং বিষগ্রন্থি বাদ দিলে স্বাদ লাগারই কথা। বিষাক্ত বলে কি মানুষ সাপ খাচ্ছে না?

কাঁকড়াবিছের যে ডাকটিকিটটি হাতের কাছে রয়েছে, সেটা প্রকাশ করেছে পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ, নাম আপার ভল্টা। অবশ্য এমনিতেই আফ্রিকাতে কাঁকড়াবিছের রাজত্ব।

আরাক্নিদা গোত্রের আর এক আটপেয়ে গুণধরের নাম হলো এঁটেল পোকা। এরা দৈর্ঘে সিকি ইঞ্চির কম এবং গ্রীষ্মমন্ডলের জীব। এই ক্ষুদে রক্তপায়ীদের দেহ চেপটা এবং শিরোবক্ষোদর দুভাগে বিভক্ত না হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। মুখ এমনভাবে তৈরী যে, তা দিয়ে এরা কামড়াতে, গর্ত করতে এবং শোষণ করতে পারে। এরা কয়েকমাস ধরে খাদ্যহীন অবস্থায় বাঁচতে পারে। কাঁকড়াবিছের সঙ্গে এদের এই বিষয়ে বেশ সাযুজ্য রয়েছে। ইনসেক্টা গোত্রের কীট ছারপোকার সঙ্গে এঁটেল পোকার যেমন চেহারাগত সাদৃশ্য আছে, তেমনি আছে চরিত্র ও ব্যবহারগত মিল। ছারপোকার মতো এঁটেল পোকাও নিশাচর শিকারী এবং পাখী, স্তন্যপায়ী, এমনকি মানুষকে আক্রমণ করে রক্তপান করে। এঁটেল পোকা শুধু গৃহপালিত জীবদের শরীরে আশ্রয় নিয়ে ক্রমশ তাদের দুর্বল করে না, সংক্রামক রোগও ছড়ায়। এঁটেল পোকা গন্ধ শুঁকে শিকার চেনে।

প্রাণীদেহ থেকে এঁটেল পোকা অপসারণ করতে হলে, তৈলজাতীয় পদার্থের প্রলেপের প্রয়োজন; সেক্ষেত্রে এইসব রক্তচোষাদের শ্বাসযন্ত্র ক্রমশ অকেজো হয়ে আসে এবং পরে সন্না দিয়ে তাদের তুলে ফেলতে হয়।

তবুও কি রক্ষা আছে? সাধারণ এঁটেল পোকা প্রায় ৩০০০ ডিম পাড়ে, এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রক্তবীজের বংশধরের মূর্তি পরিগ্রহ করে। তখন অবশ্য ছটি পাও লম্বায় ১ মিমি। এই শূকগুলি নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাবয়ব এঁটেল পোকায় রূপান্তরিত হয়। কিছু মরে হেজে গিয়েও হাজার খানেকের ওপর পড়ে থাকে। এবং তখনই শুরু হয় রক্তচোষার সঙ্গে ছোঁয়াচে রোগ ছড়ানো।

এইসব আরাক্নিদা গোত্রের প্রাণী থেকে জনসাধারণকে সচেতন করার প্রয়াসেই সম্ভবত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ডাকটিকিট মুদ্রণ দেখা যাচ্ছে। আমরা অবশ্য ডাকটিকিটের সাবধান বাণী পাবার আগেই এদের সন্তর্পণে এড়িয়ে চলি।

রানাঘাটে নেতাজীর ৯১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

রানাঘাট কোর্ট পাড়ায় নেতাজী ক্লাব আয়োজিত এবং দীলিপ কুমার শাস্ত্রীর পরিচালনায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দিপনার মধ্যে ২৩ জানুয়ারি সারা দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রিরা নেতাজী বিষয়ক বক্তৃতা ও নেতাজী সম্বন্ধীয় স্বরচিত কবিতা পাঠের ও ভারত মাতার নৃত্য নাট্য ও দেশাত্ম বোধক সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে রানাঘাট রবীন্দ্র ভবনে নেতাজীর ৯১ তম জন্ম উৎসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রানাঘাটের মহকুমা শাসক এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে রানাঘাটের বিভিন্ন সাংস্কৃতিবান মানুষ অংশগ্রহণ করে।



সংস্কৃতি সংবাদ

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও বিজ্ঞান মেলা

সম্প্রতি গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি '৮৭ জয়নগরে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা বিজ্ঞান মেলা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীআব্দুল বারি। উদ্বোধক শ্রীবারি তাঁর ভাষণে বলেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণে আজকের ছাত্র-যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জেলা সভাধিপতি শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য ও অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্ শ্রীশৈলেন মান্না প্রমুখ। চারদিনের ঐ উৎসবে ছিল রবীন্দ্রসংগীত আবৃত্তি, রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য, নাটক, কুইজ প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নবীন-প্রবীণ কবিদের নিয়ে বসেছিল কবি সম্মেলন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ, গণযাদুতে যাদুকর শ্রীদীপক রায় চৌধুরী, গ্রুপ মাইম এন্ড. ব্যালে অনুষ্ঠানে শঙ্কু সেন সম্প্রদায়। জোছন দস্তিদার পরিচালিত চার্বাক গোষ্ঠীর শিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন 'অথ শিক্ষা বিচিত্রা' নাটক। জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পৌরসভা থেকে আগত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বিজ্ঞানক্লাবের সভ্যদের ক্ষুদে মডেল বিজ্ঞান প্রদর্শনী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা ছিল জেলা যুব আধিকারিক যুবনেতা শ্রীআশিস ঘোষ ও শ্রীসুজন চক্রবর্তী প্রমুখের।

'চিত্র প্রদর্শনী' ও 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা

সমবায় পাঠাগার (পাটকল, দমদম ক্যান্ট)-এর ব্যবস্থাপনায় পাঠাগার প্রাঙ্গণে গত ৩ ফেব্রুয়ারি '৮৭ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি '৮৭ পর্যন্ত একটি বিশেষ চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। চিত্র প্রদর্শনীর বিষয় ছিল 'সভ্যতার ক্রমবির্বতনের ইতিহাস' এবং 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'। চিত্র প্রদর্শনী ছাড়া ৩ ফেব্রুয়ারি '৮৭ পাঠাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। উক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বহু প্রতিযোগী স্থানীয় ও বহিরাগত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দলগত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন শ্রীদিলীপ দাস ও শ্রীঅরিজিৎ বসুকে নিয়ে গঠিত দলটি এবং বিজিত হয় অরুন গোস্বামী ও পার্থ বোসকে নিয়ে গঠিত দলটি। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হন শ্রীসসীম কুমার বারুই এবং দ্বিতীয় হন শ্রীমতী সঙ্গীতা মন্ডল। পরদিন (৪ ফেব্রুয়ারি '৮৭) সকালে পাঠাগার প্রাঙ্গনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বহু শিশু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় শান্তনু চক্রবর্তী, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয় যথাক্রমে দেবানু মন্ডল এবং শুভজিৎ চ্যাটার্জী। প্রতিটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে পাঠাগার প্রাঙ্গণে বহু জনসমাবেশ ঘটে।

প্রতিদিন চিত্র প্রদর্শনী দেখতে প্রচুর দর্শক সমাবেশ ঘটেছিল। চিত্র প্রদর্শনী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে অভিনন্দন বার্তা পাঠান রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যান দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী।

'ছন্দম্'-এর বাৎসরিক নৃত্যানুষ্ঠান

বালুরঘাট 'ছন্দম্' কলাকেন্দ্র আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সন্ধ্যা ৬টায় বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ছন্দম্ কলাকেন্দ্রের কুশলী শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্রগীতি নৃত্য, রবীন্দ্র নৃত্য নাট্য সুন্দরভাবে পরিবেশন করে। রবীন্দ্র নৃত্য নাট্যে অংশগ্রহণ করেন রূপা ব্যানার্জি, সংঘমিত্রা সিন্হা, শর্মিষ্ঠা সাহা, কেয়া সরকার, অনিন্দিতা সেন, চৈতালী দাসগুপ্তা, সঙ্গীতা ঘোষ, মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ালী দাস, কুন্ডলা মুখার্জি প্রভৃতি শিল্পী বৃন্দ। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ চিত্রাঙ্গদা (কুরূপা) অভিনয়ে রূপা ব্যানার্শি মোটামুটি অভিনয় করেন। (সুরূপা) অভিনয়ে সংঘমিত্রা সিন্হা সাবলীল অভিনয় করে। অন্যান্য শিল্পীরাও অভিনয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। কণ্ঠ সঙ্গীতে মালবিকা খাঁ, শিপ্রা দে ও বিকাশ সরকার নাটকটিকে খুবই আকর্ষণীয় করে তোলেন। দ্বিতীয় দিন ৯ ফেব্রুয়ারি ছন্দম কলাকেন্দ্রের শিল্পীরা চাষী নৃত্য, সাঁওতালী নৃত্য, মাখন চুরি, পালা পরিবেশন করেন। নৃত্যনাট্য 'আলিবাবা' ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। শিল্পীদের মধ্যে মর্জিনা ভূমিকায় রূপা ব্যানার্জি ও আলিবাবা ভূমিকায় শ্রীশুভজ্যোতি রায়ের অভিনয় ছিল খুবই উন্নত মানের। রাবেয়া ভূমিকায় অভিনয়ে ইন্দ্রানী দাস খুবই সাবলীল ভঙ্গিতে অভিনয়ে করে দর্শকদের মন জয় করেন। তাছাড়া নাটকটিতে দলগতভাবে ভকলের অভিনয়ই সুন্দর।

দুর্গাপুরে লেখক শিল্পীদের সাহিত্য সভা

বাঁকুড়ার সুপরিচিত সাহিত্য পত্র 'রাঢ় পরিবেশ'এর উদ্যোগে ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরের এ-জোন স্টিল ক্লাব হলে বার্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের অধিবেশনে 'ছোট' পত্র-পত্রিকার বর্তমান ও ভবিষ্যত বিষয়ে আলোচনার উদ্বোধন করেন রানীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ডঃ রামদুলাল বসু। অংশগ্রহণ করেন মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত, আরতিকুমার বসু, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, নন্দ চৌধুরী, ডঃপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ভট্টাচার্য। দ্বিতীয়



দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও বিজ্ঞান মেলায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রীআবদুল বারি ও সংগঠক শ্রীসুজন চক্রবর্তী।

দিনের প্রথম অধিবেশনের কবিতা পাঠে অংশ নেন শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিরাম মুখার্জি, মিহির চ্যাটার্জি, শিবশক্তি চক্রবর্তী, ভোলানাথ ব্যানার্জি। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির প্রগতি' বিষয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। উদ্বোধন করেন অমলেন্দু ভৌমিক। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সহ মানবসম্পদের গণমুখী প্রসারকে অন্যতম শর্ত বলে কল্পতরু সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মণি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তারপদ ধর, এস. বদরুদ্দোজা প্রমুখ মত প্রকাশ করেন।

বনগ্রামে ১২৫-তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উৎসব

বনগ্রাম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গত ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭ বনগ্রাম থানা ময়দানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫-তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি বনগ্রাম মহকুমা শাসক প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীসরোজ ব্যানার্জী। তিনি বলেন কবিগুরু ছিলেন জাতীয় সংহতির প্রতীক। বর্তমান ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যেভাবে জাতীয় সংহতি নষ্ট করে চলেছে প্রজাতন্ত্র দিবসে কবিগুরুকে স্মরণ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে যেতে হবে এবং জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ও বনগ্রাম মহকুমা আরক্ষা আধিকারিক। অধ্যাপক ঘোষ তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে মহকুমা শাসক রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হতে সকলকে আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীদেবকী দুলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শ্যামলী সরকার। আবৃত্তি করে শ্রীমতী রিনি পাল। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী চৈতালী সিংহ ও অভিযান সংঘের সদস্যবৃন্দ। সবশেষে বাংলার ব্রতচারী সমিতি, বনগ্রাম শাখা ও অভিযান সংঘের যৌথ প্রযোজনায় "শ্যামা" নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। বনগ্রাম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কানপুরে একাঙ্ক নাট্য উৎসব

কানপুর (হাওড়া) সেবা সংঘ আয়োজিত সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা ষষ্ঠ বর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হয় তেইশে জানুয়ারি ১৯৮৭। তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ ও ছাব্বিশে জানুয়ারি-চারদিন ব্যাপী পশ্চিমবাংলার কুড়িটি প্রগতিশীল উন্নতমানের নাট্যগ্রুপ তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তেইশে জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে স্থানীয় বিধানসভার সদস্য শ্রীবারীন্দ্রনাথ কোলে, শ্রীপ্রবীন নাট্যকার শ্রীকিরন মৈত্র ও শ্রীনিমাই মান্না। তাঁরা সাম্প্রতিক নাটকের গতিপ্রকৃতি, মফঃস্বলে নাট্য প্রযোজনার সমস্যা ও এই বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সফল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ১ ফেব্রুয়ারি নাটক বিষয়ক আলোচনাসভা ও বিজয়ীবরণ অনুষ্ঠানে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দু হাজরা রবীন্দ্রনাথ এবং উত্তরকালের নাটকের ওপর বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা অধ্যক্ষ শ্রীঅশোক কুণ্ডু গ্রামাঞ্চলে নাটক প্রযোজনা, নাটকের সাম্প্রতিক রীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ক'রে প্রতিযোগী গ্রুপগুলিকে উৎসাহিত করেন। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন শ্রীবিবেকানন্দ পাল ও শ্রীস্বপন নন্দী। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও বিশেষ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মান অর্জন করেন-উজান, নানামুখ, অভিনয়, শৈল্পিক। শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান পান শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় (উজান), শ্রীবিকাশ মাঝি (বেলুড় সেন্ট্রাল কটন মিল রিক্রিয়েশন ক্লাব) শ্রীঅসীম বসু (রসিদপুর স্পোর্টিং ক্লাব), শ্রমতিজয়তী ঘোষ (অভিনয়)। এই উৎসবটি বহু নাট্যরসিক এবং নির্বিশেষ মানুষের উপভোগ্য হয়েছিল। এই উপলক্ষে 'বাগীশ্বরী' নামে স্মারক সংকলন প্রকাশিত হয়। খিলা চৈতালী সংঘ নির্দেশিত 'এসো সুন্দর' নৃত্যনাট্য বুদ্ধদেব মন্ডল ও নৃপা দত্তের পরিচালনায় এদিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সপ্তাহব্যাপী সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঞ্জয়নন্দী, সুজয় মুখার্জী নবকুমার নন্দী।

আলিপুরদুয়ারে ১২৫তম জন্মজয়ন্তী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি ব্লক ও পৌরসভার বিগত অনুষ্ঠানের কৃতী প্রতিযোগীদের নিয়ে জেলা রবীন্দ্র-জন্ম-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়ম ইনস্টিটিউট (গীতাঞ্জলী মঞ্চ), আলিপুরদুয়ার উচ্চ বিদ্যালয় (পূরবী মঞ্চ) এবং রেলওয়ে ইনস্টিটিউট (বলাকা মঞ্চ) থেকে।

১২৫তম রবীন্দ্র-জন্ম-জয়ন্তী জেলা উৎসবের তিনদিনের অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল রবীন্দ্রনাটক প্রতিযোগিতা, নৃত্যনাট্য (চন্ডালিকা) প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র-সংগীত, বসে আঁকো ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভা। এছাড়া রাজ্য সরকারি কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা কর্তৃক রবীন্দ্র-কাব্যের সাওয়াল 'জবাব', প্রগতি স্পোর্টিং, আলিপুরদুয়ার জংশন কর্তৃক রবীন্দ্র-ব্যালেনৃত্য, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা, ফালাকাটা কর্তৃক নাটক "রক্ত করবী", বিভিন্ন আমন্ত্রিত শিল্পী কর্তৃক নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত এবং সারস্বত সম্মেলন, কলকাতা কর্তৃক নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' ও 'মায়ার খেলা' পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দাস। তিনি তাঁর স্বাগত ভাষণে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন আলিপুরদুয়ার ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীহরিকিশোর সরকার।

তিন দিনের বিভিন্ন আলোচনা সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুরঞ্জন দত্তরায়, কুচবিহার বি, টি, কলেজের অধ্যাপক ডাঃ দিগ্বিজয় দে সরকার এবং শ্রীপরিতোষ খান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসাধারণ প্রতিযোগী এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনুষ্ঠানের শেষ দিন বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অগ্রবাণীর ৪০ তম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

২৫ জানুয়ারি '৮৭ রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায় বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে (মেন) ভবনে ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঐসব বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের অগ্রবাণীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন কালীকমলা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস এর প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী বনলতা চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীশংকরীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়।

পূর্ব কোলকাতার দেশবন্ধু হাইস্কুল, নারকেলডাঙগা হাইস্কুল, শ্যামাপ্রসাদ হাইস্কুল, শুড়া কন্যা বিদ্যালয়, কালীকমলা বিদ্যাপীঠের মোট ৮৩ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত "রবীন্দ্র জীবন কথা" পুস্তক এবং এক মানপত্র প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীবন্দোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সমবেত সংগীত পরিবেশন করে অগ্রবাণী সাংস্কৃতিক চক্রের শিল্পিবৃন্দ।

অগ্রবাণীর ৪০ তম বর্ষের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ২৬ জানুয়ারি বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের হলে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ শ্রীশৈলেন মান্না ও বিশিষ্ট চিত্রকর শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবি অধ্যাপক শ্রীতরুণ সান্যাল।

ইসলামপুরে প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬ জানুয়ারি ১৯৮৭ সকাল ৯টায় ইসলামপুর উচ্চ বালক বিদ্যালয় ময়দানে ৩৮তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক শ্রীগোপালকৃষ্ণ। সুবেদার লোকবাহাদুর রাই-এর পরিচালনায় সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক এবং ইসলামপুর এস,ডি,পি, ও শ্রী পি,টি, শেরপা। কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেছিল ইসলামপুর আরক্ষা বাহিনী, হোমগার্ড, এন,সি,সি ইসলামপুর কলেজ এন,সি,সি ইসলামপুর উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ইসলামপুর মণিমেলা, করমদিঘী মণিমেলা এবং ফায়ার ব্রিগেড।

উক্ত অনুষ্ঠানে ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইসলামপুর কেন্দ্রের ৫ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে "বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কলারশিপ" প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক। পুরস্কার হিসাবে প্রত্যেকে ২০২ টাকার চেক দেওয়া হয়।

দুই জন পুলিশ কর্মচারীকেও পুরস্কার দেওয়া হয়।

মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে, ইসলামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, শিশুশিল্পী সুরের নাটে ও করণদীঘি মণিমালা। ড্রিল প্রদর্শন করে ঐকতান গোষ্ঠী।

এই অনুষ্ঠানে সব চেয়ে আনন্দদায়ক বিষয় "টাগ-অব-ওয়ার"-এ অংশ গ্রহণ করেছিল মহকুমা শাসক অফিস বনাম বার এসোসিয়েশন। উক্ত প্রতেযোগিতায় মহকুমা শাসক অফিস জয় লাভ করে।

কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক। প্রথম স্থান অধিকার করে ইসলামপুর আরক্ষা বাহিনী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইসলামপুরে উচ্চ বালক বিদ্যালয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইসলামপুর মণিমালা।

সন্ধ্যায় ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এর "চলচ্চিত্র" প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মিবৃন্দ এবং ইসলামপুর মহকুমা শাসকের অফিসের কর্মিবৃন্দ।

সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

সম্প্রতি ২৬ জানুয়ারি ৩৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক শ্রীভাস্কর চন্দ্র খুলবে, আই.এ.এস. তাঁর কার্যালয় সংলগ্ন ময়দানে সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর তিনি রাজ্য ও জেলা আরক্ষাবাহিনী, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী, কেন্দ্রীয় আরক্ষাবাহিনী, অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী, জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী প্রভৃতি বাহিনী পরিদর্শন করেন এবং সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। সম্মিলিত বাহিনী জয়হিন্দ ধ্বনি দেয়। মহকুমা শাসক বাহিনীর উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

এরপর ভারতীয় রেডক্রশের দুর্গাপুর শাখা, জাতীয় সেবাপ্রকল্পের অধীন দুর্গাপুরের তিনটি মহাবিদ্যালয় এবং দুর্গাপুরের চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে প্রদত্ত তিনটি চলমান প্রদর্শনী ময়দান প্রদক্ষিণ করে।

কুচকাওয়াজ শেষ হলে দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কসের শিশু শিল্পীরা সমবেত ক্রীড়া প্রদর্শন করে এবং পূর্বাভাষ সব পেয়েছির আসরের সদস্যাবৃন্দ ও জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর মহিলা সদস্যাবৃন্দ জাতীয় সংহতির উপরে নৃত্য ও গীত পরিবেশন করেন।

বেলা ১১-৩০ মিনিটে দুর্গাপুর রেডক্রশের পক্ষ থেকে রেডক্রশ সভাপতি ও দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সাধারণ ও কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ফল ও বিস্কুট বিতরণ করেন। এদিন দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে এবং লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে এম.এ.এম.সি হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করাহয়। সন্ধ্যায় দুর্গাপুর মহকুমা তথ্য কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এক তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আলিপুরদুয়ারে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ জানুয়ারি '৮৭ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের ৩৮তম বার্ষিক উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়।

এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠান ম্যাক উইলিয়ম ইনস্টিটিউট মাঠ থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার শহর পরিক্রমা করে প্যারেড গ্রাউন্ডে আসে।

সকাল ৯টায় আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসক শ্রীরাঘবেন্দ্র সিং জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সকাল ৯-০৫ মিনিটে আরক্ষাবাহিনী, জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী এবং বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক সশস্ত্র অভিবাদন গ্রহণ করেন।

এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মণিমেলা সব পেয়েছির আসর, আলিপুরদুয়ার গার্লস হাইস্কুল, নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল, নির্মলা গার্লস কনভেন্ট স্কুল ও পূর্বাঞ্চল কালচারাল ক্লাব।

প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী নিউটাউন গার্লস হাই-স্কুলকে পুরস্কার বিতরণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে এবং অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বেলা ১১টা স্থানীয় অমর টকীজে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং বেলা ১১-৩০টায় মহকুমা হাসপাতালের অন্তর্বিভাগের রোগী ও কারাগারের কয়েদীদের ফল বিতরণ করা হয়।

'নমামি'র বার্ষিক অনুষ্ঠান

পরিবেশিত হলো সুন্দর নাটক

১৫ ফেব্রুয়ারি '৮৭ সকাল সাড়ে নটায় উত্তর কলকাতার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো 'নমামি' সাংস্কৃতিক সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হলো একটি সুন্দর নৃত্য নাটক—'দেশ আমার'।

'নমামি'র অনুষ্ঠান শুরুতে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করলেন শ্রীমতী ছন্দা দাস। এরপরে সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী বেলা দে সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতার কামনা করলেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী ভারতী সাহা জানান, নমামি সবুজ স্বপ্ন দেখায়, দেখে এবং নমামি আপনার, আমার সকলের। মানসিক অবক্ষয়কে দূরে ঠেকিয়ে শিল্পীর ধ্যানই নমামি'র লক্ষ্য। সম্পাদিকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু'র প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী পড়ে শোনান। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে ছেনঃ "নমামি সংস্থার উদ্যোগে 'দেশ আমার' শীর্ষক এক গীতিনাট্য শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।"

এরপর আরম্ভ হয় নমামি গোষ্ঠী নিবেদিত "দেশ আমার" গীতিনাট্য। নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায় আছে ইলোরা সাহা। প্রযোজনা করেছেন বেলা দে। মঞ্চ ও আলো ছিল হীরক মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। সংলাপে/নেপথ্যে পার্থ ঘোষ এবং গৌরী ঘোষ গলা দিয়েছেন। নেপথ্য কন্ঠে (গানে) আছেন হৈমন্তী শুক্লা, পিন্টু ভট্টাচার্য, মালা মৈত্র, প্রণব ঘোষ, সুমিত মুখার্জি, চঞ্চল পাল ও নমামি গোষ্ঠী। কাহিনী, নাট্যরূপ, সঙ্গীত (কথা ও সুর) ও নির্দেশনা ভারতী সাহা।

অভিনয়ে নাট্যকারের মায়ের চরিত্রে মালা মৈত্র, সূত্রকার অর্ঘের চরিত্রে শৌভিক সাহা সঙ্গে আছে সুমিত মুখার্জি (নাট্যকার), ইলোরা সাহ (ধ্রুবা), চন্দন মুখার্জি (বাস্তব), ব্রততী সেনগুপ্ত (মোহিনী), প্রদীপ দাস (ধীমান), সোমা চক্রবর্তী, কাকলি ভট্টাচার্য (সোহিনী, সহেলী), শংকর মিত্র (পল্লব), সুনীল পাল (বিগলিত) এবং অগ্নি ও শৌনকের চরিত্রে অনুপম সাহা ও চঞ্চল পাল।

নৃত্যে আছেন ইলোরা সাহা, সুমিত মুখার্জি, শৌভিক সাহা, ছন্দা দাস, সুদেষ্ণা মৈত্র, ব্রততী সেনগুপ্ত, অনুপম সাহা, শংকর মিত্র, চন্দনা দাস, শিপ্রা দাস, মালা সিন্‌হা ও রিঙ্কু সাহা।



'দেশ আমার' নাটকে একটি দৃশ্যে ইলোরা সাহা ও সুমিত মুখার্জি।

রুটি ও বিস্কুট সংস্থাসমূহের আধুনিকীকরণ প্রকল্প ও কর্মশালা

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, ১৯৮৭, জলপাইগুড়ি জেলা শিল্প কেন্দ্রের ব্যবস্থাপণায় দুইদিন ব্যাপী রুটি ও বিস্কুট শিল্পসংস্থাসমূহের আধুনিকিকীরণ প্রকল্প সমাবেশ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি যোগেশচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে ও জেলা শিল্প কেন্দ্রে। উত্তর-বঙ্গের ৫টি জেলা থেকে ১৫০ জন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা,শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীনির্মল বসু। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় আজ এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এর গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ কুটির শিল্পের মধ্যে রুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি তৈরি অন্তর্ভুক্ত। এই বেকারীর মাধ্যমে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, ব্যাঙ্ক থেকে কিংবা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে অনেকে বেকারী খুলেছেন তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের কেক, রুটির খুব সুনাম আছে এবং এর চাহিদাও প্রচুর। এই হোটেলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজ্য সরকার এর অধিগ্রহণ করেছেন। আজ এই শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া দরকার। জলপাইগুড়ি শহরে একটি সর্বাধুনিক রুটি, কেক্ ও বিস্কুট তৈরির কারখানা দরকার। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে শিল্পে আধুনিকীকরণ দরকার। বেকারী শিল্পের আধুনিকিকরণ হলে উৎপাদন ব্যয় কম হবে। পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকবে। জ্বালানী খরচ কম হবে। দূষণ-মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলা থেকে যে সব প্রতিনিধি এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন তাঁরা ফিরে গিয়ে এই শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের সঙ্গে আধুনিকীকরণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এই শিল্পের উন্নতি হবে। তিনি কর্মশালার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীনৃপেন দাস বলেন যে, আজকাল মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। রুটি, কেক্ ও বিস্কুটের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সেইজন্যই বেকারী শিল্পকে অবহেলা করলে চলবে না। আজ এই শিল্পে আধুনিকীকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাহর্তা। তিনি বলেন যে, ভালভাবে শিল্প চালাতে হলে আধুনিকীকরণ দরকার। কিন্তু কি ভাবে সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে আধুনিকীকরণের ব্যাপারে সেটা অনেকে জানেন না, এবং আধুনিকীকরণের ফলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে সেটা জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। এর জন্য দরকার ব্যাপক প্রচার। এইরূপ সেমিনার গ্রামে-গঞ্জে সম্ভব কিনা তিনি সংশিল্ষ্ট কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন।

বিবিধ সংবাদ

রক্তদান কর্মসূচি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সকাল ১০টায় ইসলামপুর মিডিল স্কুল ময়দানে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ইসলামপুর মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরিচালনায়।

উক্ত রক্তদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামপুর মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহঃ সভাপতি শ্রীতপন ভৌমিক এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ইসলামপুর মহকুমার প্রাক্তন স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ নীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীঅসিত ঘোষ মজুমদার।

রক্তদান কর্মসূচিতে ১৭৫জন কর্মচারী রক্ত দান করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু রক্ত গ্রহণের স্থান ও জমা রাখার অসুবিধার জন্য মাত্র ১৫ জন কর্মচারি রক্ত দান করতে পারেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ব্লাড্ ব্যাঙ্ক থেকে আগত রক্তগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের প্রধান ডাঃ স্বপন পাল উপস্থিত কর্মচারিবৃন্দকে অভিনন্দন জানান এবং আগামীতে আর একটি শিবির করার কথা বলেন। জেলা কো-অর্ডিনেশান কমিটির প্রতিনিধি শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী রক্তদান বিষয়ের উপর গঠিত দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য প্রধান রক্তদাতাগণের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ডিভিসান একাউন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রীশিশির গুহ। এসোশিয়েসনের ট্রেড্ ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসার্স এসোসিয়েশনের শ্রীপ্রবীর দাস। 'নারীনক্ষত্র' পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীবিবেকানন্দ বর্মন এবং "শিশির বিন্দু" পত্রিকার শ্রীনকুল দাস। সবশেষে মহকুমা কো-অর্ডিনেশান কমিটির সহঃ সভাপতি তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতপন ভৌমিক উপস্থিত সকল কর্মচারিকে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এই রক্তদান কর্মসূচি সাফল্য মন্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

বাঁকুড়া পশুপালন বিভাগ কর্তৃক পোলট্রি সেমিনার

গত ১ ফেব্রুয়ারি সিমলা পাল থানার বিক্রমপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বাঁকুড়া জেলা পশুপালন বিভাগের উদ্যোগে একটি পোলট্রি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই পোলট্রি সেমিনারে সভাপতিত্ব করেত বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীদীনবন্ধু মহান্তী এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক। সভাপতির ভাষণে শ্রী মহান্তী বলেন যে, এই সেমিনারের মুখ্য আলোচ্য গ্রামের মানুষের উন্নতি, গ্রামের মানুষের উন্নতি করতে গেলে আগে চাই সমস্ত জিনিষের ঠিকমত যোগান। বাঁকুড়ার অর্থনীতি খুবই সংকটাপন্ন কারণ এই জেলায় কোন শিল্প নাই। এই জেলার এখনো পর্যন্ত ৪০ ভাগ জমিতে চাষ দেওয়া যায় না। গ্রামের মানুষের আয় বাড়াতে গেলে আগে চাই চাষের উন্নতি করা। তারপর কুটীর শিল্পের। গ্রামের ৪০% মানুষ আজ ক্ষেত মজুর। তাই তাদের উন্নতি করতে গেলে চাই মুরগী পালন বা পশুপালন করা। বেকারদের ক্ষেত্রে এই মুরগী চাষটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি জোর দেন। বিশেষ করে ব্রয়লার মুরগী চাষ করার উপর জোর দেন কারণ এটা বিশেষ লাভজনক।

৬টি ব্লক থেকে প্রায় ১৫০ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রতি ব্লকের কিছু কিছু সদস্য মুরগী পালনের জন্য কি কি অসুবিধা রয়েছে তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরেন এবং কর্তৃপক্ষকে অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য আবেদন জানান।

এই সমস্যাগুলি সমাধানের উপর জোর দিয়ে বক্তব্য রাখেন পশুপালন বিভাগের উপ-অধিকর্তা শ্রীশিশির কুমার সরকার, প্রাক্তন



সরকারি কর্মচারী সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ইসলামপুরে রক্তদান শিবিরে রক্তদান করছেন শ্রী গোলাম মোস্তাফা মোল্লা এবং শ্রীঅসিত ঘোষ মজুমদার।

উপ-অধিকর্তা শ্রীভূদেব চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সচিব শ্রী দিলীপ কুমার পাল এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী সুনীল কর্মকার। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রী বিধুভূষণ দাস মহাশয়।

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেলা ১১-৩০ মিনিটে তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে একটি ফলকের উদ্বোধন করা হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ থেকে ঐ ফলক উন্মোচিত করেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী এবং বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য শ্রী রামনারায়ণ গোস্বামী এই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রাক্তন মন্ত্রী মহাশয়। সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র দে। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন শ্রীপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দুর্গাপুর শাখার সদস্য তাছাড়া বক্তব্য রাখেন শ্রীকিশোর মন্ডল। এঁরা দুজনেই ব্লাড ব্যাংকের স্থাপনের প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করেন। শ্রীকিশোর মন্ডল অন্যান্য আন্দোলনের সাথে সাথে স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শ্রীরামনারায়ণ গোস্বামী স্থানীয় ডাক্তারদের এই ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে সচেতন থেকে সেবার মানসিকতা নিয়ে চিকিৎসা কার্য চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। নেতাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এই উপলক্ষে এদিন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দুর্গাপুর শাখার পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা রক্তদান করেন।

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে অনুদান

রাজ্য সরকার কলকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালকে ৫৫,৫৫০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেছেন- কর্মচারীদের বেতন এবং হাসপাতালের একটি শয্যার রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ।



এন.সি.সি.-র বাৎসরিক অনুষ্ঠান

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালে কলকাতা ময়দানের এন.সি.সি ক্লাব হাউসে,রাজ্যের এন.সি.সির ১নং ব্যাটালিয়ান-এর উদ্যোগে মাদারটেরেসার আহ্বানে, রক্তদান এবং বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ব্রিগেডিয়ার টি, কে, গুপ্ত এবং পুরস্কার বিতরণ করেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ফাদার ম্যাথুজ। সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ক্যাডেটদের কৃতিত্বে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং আগামী দিনে ঐ সমস্ত ক্যাডেটদের কাছ থেকে জাতির উচ্চাশার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানের এর বছরের জুনিয়ার ডিভিশনের বেস্ট ক্যাডেট, বেস্ট শুটার, বেস্ট ইনযোগা এবং বেস্ট-টার্নআউট পুরস্কার গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীমান সৃজন মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল ঘোষ, সঞ্জয় মজুমদার, সুনন্দ সেনগুপ্ত এরা সকলেই সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দশম শ্রেনীর ছাত্র। মোট ১১টি পুরস্কারের মধ্যে সাউথ পয়েন্ট স্কুল মোট ৯টি পুরস্কার অর্জন করে, বাকি দুটি পুরস্কারের মধ্যে ১টি পায় সরসুনার ভূতনাথ হাইস্কুল এবং অপরটি পায় বিষ্ণুপুর হাই স্কুল।

পুরস্কার বিতরণের পর রক্তদান অনুষ্ঠান শুরু হয়।

শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান

গত ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে দুর্গাপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দুর্গাপুর তথ্যকেন্দ্রে এক সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ৯টায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক শ্রীভাস্কর চন্দ্র খুলবে,। মহকুমা শাসক তাঁর সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে এই দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং, সংহতির প্রশ্নে দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তারপর পর্যায়ক্রমে হিন্দু, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন এবং প্রয়াত মহাত্মাজীর আত্মার প্রতি শান্তি কামনা জানিয়ে প্রার্থনা করেন। এরপর জেলা কুষ্ঠ নিবারণী সংস্থার দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে তথ্য দপ্তরে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনাচক্রে সমবেত শ্রোতৃমন্ডলীর সামনে ঐ সংস্থার পরিচালক সদস্যগণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন। দুপুরে দুর্গাপুর রেডক্রশ এর তরফ থেকে ৫৫ জন কুষ্ঠরোগীর মধ্যে ফল, মিষ্টি, বিস্কুট, বাটার অয়েল, গম প্রভৃতি বিতরণ করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত

এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। বৈকালে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি এবং ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

জাতীয় সংহতি বিষয়ে আলোচনাচক্র

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি '৮৭ বাদুড়িয়া ব্লকের অন্তর্গত রুদ্রপুর রাধাবল্লভ হাইস্কুলে সুসংবদ্ধ প্রচার অভিযানে বসিরহাট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে "ভারতে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা" এই শিরোনামে এক প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী যথাক্রমে কুমারী অমৃতা মণ্ডল, শ্রীজয়দেব রায় ও কুমারী মানসী চৌধুরী প্রভৃতিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতার পর এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শ্রীসুধীর কুমার পাত্র, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীননী গোপাল গাঙ্গুলী প্রমুখ। সন্ধ্যায় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

'রেবিস' রোগের ওপর আলোচনাচক্র

পশ্চিমবঙ্গ পশু চিকিৎসক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি '৮৭ যথাক্রমে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় জেলা পশুচিকিৎসক সমিতির সভাপতি ডাঃ প্রবীর মিত্র জানান যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ পশুদের পোষ মানিয়ে তাদের সাথীকরেছে নানা প্রয়োজনে। এই সহ অবস্থানের ফলে বেশ কিছু রোগ পশু থেকে মানুষেরও মানুষ থেকে পশুর মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। এই রোগগুলিরমধ্যে অন্যতম মারাত্মক রোগ 'রেবিস' যা কুকুরের কামড়ের দরুণ মানুষের শরীরে দেখা দেয়। রোগ দেখা দিলে ফল মৃত্যু। রাজ্যের অন্য জেলার তুলনায় আলিপুরদুয়ারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে রাখা হয়েছে, সারা ভারতে বছরে ১৫-২০ হাজার লোক 'জলাতঙ্ক' নামক ভাইরাস ঘটিত রোগে মারা যায়। আক্রান্ত হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার জন। কলকাতার পাস্তুর ইন্সটিটিউটে দৈনিক ১৫০-২৫০ জন চিকিৎসার জন্য টীকা নেন।

এই রোগের বিরুদ্ধে ঔষধ নেই তবে প্রতিষেধক টীকা আছে জনস্বাস্থ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী এ রোগ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পশু চিকিৎসক সমিতির প্রয়াস এই সেমিনার। দু'দিন অনেক (প্রায় ৩০০) জনসমাগম হয়, যোগ দেন চিকিৎসক, পশুচিকিৎসক, বিজ্ঞানী, খামারী। বক্তব্য রাখেন ডাঃ জি.পি. সেন-খ্যাতনামা অধ্যাপক অল ইন্ডিয়া এ্যানিমেল হেলথ্ এ্যাসোসিয়শনের সহ-সভাপতি, রিসার্চ অফিসার ডাঃ জ্যোতির্ময় সমাদ্দার, ডাঃ এম, এন নন্দী, ডাঃ সুশান্ত দাস, শ্রীননী গোপাল সরকার ও অনেকে। আলিপুর-দুয়ারের মহকুমা শাসক শ্রীরাঘবেন্দ্র সিং ১৪।২।৮৭ আলিপুরদুয়ারে উপস্থিত ছিলেন। মনোজ্ঞ আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই রোগের সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশিত হয়। পশুচিকিৎসা কৃত্যকের প্রচার-শাখা থেকে 'রেবিস' দি কিলার ডিজিস্' নামে এক তথ্য সমৃদ্ধ ফিল্ম দেখান হয়। ডাঃ তারক কর, ডাঃ সমর সাহা, ডাঃ গৌর দে, ডাঃ প্রবীর দত্ত, ডাঃ সীতেশ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় আলোচনাচক্রগ দুটি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁকুড়া পশুপালন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত পোলট্রি সেমিনার ১৯৮৭

গত ১০ ফেব্রুয়ারি সিমলাপাল থানার বিক্রমপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বাঁকুড়া জেলা পশুপালন বিভাগের উদ্যোগে একটি পোলট্রি সেমিনারের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই পোলট্রি সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীদীনবন্ধু মহান্তী এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীসুনীল চন্দ্র কর্মকার। সভাপতির ভাষণে শ্রীমহান্তী বলেন যে, এই সেমিনারের মুখ্য আলোচ্য গ্রামের মানুষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামের মানুষের উন্নতি করতে গেলে আগে চাই সমস্ত জিনিষের ঠিকমত যোগান। বাঁকুড়ার অর্থনীতি খুবই সঙ্কটাপন্ন কারণ এই জেলায় কোন শিল্প নাই। এই জেলায় এখনো পর্যন্ত ৪০ভাগ জমিতে চাষ দেওয়া যায় না। গ্রামের মানুষের আয় বাড়াতে গেলে আগে চাই চাষের উন্নতি করা তারপর কুটীর শিল্পের গ্রামের ৪০% মানুষ আজ ক্ষেত মজুর। তাই তাদের উন্নতি করতে গেলে চাই মুরগী পালন বা পশুপালন করা। বেকারদের ক্ষেত্রে এই মুরগী চাষটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি জোর দেন। বিশেষ করে ব্রয়লার মুরগী চাষ করার উপর জোর দেন কারণ এটা বিশেষ লাভ জনক।

৬টি ব্লক থেকে প্রায় ১৫০ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রতি ব্লকের কিছু কিছু সদস্য মুরগী পালনের জন্য কি কি অসুবিধা রয়েছে তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরেন এবং কর্তৃপক্ষকে অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য আবেদন জানান।

এই সমস্যাগুলি সমাধানের উপর জোর দিয়ে বক্তব্য রাখেন পশুপালন বিভাগের উপ-অধিকর্তা শ্রীশিশির কুমার সরকার, প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা শ্রীভূদেব চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সচিব শ্রীদিলীপ কুমার পাল এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীসুনীল চন্দ্র কর্মকার অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ দাস মহাশয়।

'কর্মবিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা': বাঁকুড়ায় একটি আলোচনাচক্র

গত ২৮ জানুয়ারি বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে "কর্মবিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা" এই বিষয়ের উপর আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরঞ্জিত চ্যাটার্জী। জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ধর্মদাস বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সংক্ষেপে কর্মবিনিয়োগের সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ব্যাখ্যা করেন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীপ্রতীপ মুখার্জী বিশদভাবে কর্মবিনিয়োগের সম্ভাবনাগুলি বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলি ব্যাখ্যা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীধর্মদাস বিশ্বাস বলেন কিভাবে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের বাবদ সুযোগ বেকার যুবকরা গ্রহণ করতে পারেন সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় কলেজ সংলগ্ন প্রাঙ্গনে চলচ্চিত্র প্রদর্শণীর ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রাইসেম প্রকল্পে পোলট্রি ট্রেনিং

২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি গত জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ২০০ জন বেকার যুবক যুবতীর 'ট্রাইসেম' প্রকল্পে পোলট্রি-ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেন। ট্রেনিং-এর প্রশিক্ষক ছিলেন ব্লকের ভেটেরিনারী সার্জেন ডাঃ স্বপন কুমার দে। গত ১৩

ফেব্রুয়ারি স্থানীয় নিবেদিতা গার্লস স্কুলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবক যুবতীদের সার্টিফিকেট এবং স্টাইপেন্ড প্রদান করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুভাষ চন্দ্র আবিন্দা। এই অনুষ্ঠানে সরকারের পোলট্রির বিভিন্ন স্কীম নিয়ে বক্তব্য রাখেন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার শ্রীঘোড়ুই। এছাড়া মৎস্য ও পশুপালন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত জানা এবং জেলা পরিষদের সদস্য আহম্মদ ইসরাইল মল্লিক পোলট্রি ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। এই পঞ্চায়েত সমিতি-এর আগেও 'ট্রাইসেম' প্রকল্পে ২০০ জনের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছিলো। এর ফলে এখন বহু বেকার যুবক যুবতী পোলট্রি-কে তাদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন।

বহরমপুরে সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭ নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আড়ম্বরের সংগে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয় বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে। এই উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রীসমর ঘোষ পতাকা উত্তোলন এবং সমবেত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। একই সংগে ৩৮টি তোপধ্বনি হয় এবং শান্তির পারাবত ও বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, জেলা সশস্ত্র আরক্ষা বাহিনী, জেলা হোমগার্ড, ফায়ার সার্ভিস, সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স সহ ছাব্বিশটি প্ল্যাটুন কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংঘের তরফ থেকে প্রদর্শিত ড্রিল, শারীরিক কলাকৌশল, লোক সংগীত সহযোগে লোকনৃত্য উপস্থিত অগণিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর অংশগ্রহণকারী প্রতি দলকে টিফিন প্যাকেট প্রদান করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যায় সদর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ঐ ময়দানে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে।

বহরমপুরে শহীদ দিবস ও সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভা

গত ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৭ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বহরমপুরে রবীন্দ্রসদনে যথোচিত মর্যাদায় সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান দ্বারা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে বহরমপুরের সব পেয়েছির আসরের মেয়েরা রামধুন সংগীত পরিবেশন করেন।

কুটির শিল্প আধুনিকীকরণঃ আলোচনা সভা

হাওড়া জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারের উদ্যোগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি রোটারি ক্লাবের কমিউনিটি হলে হাওড়া জেলায় ক্ষুদ্রশিল্পের আধুনিকীকরণ ও শিক্ষার ওপর এক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়।

দুদিনব্যাপী আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন হাওড়ার জেলাশাসক শ্রী জি বালচন্দ্রন। উদ্বোধনী ভাষণে জেলা শাসক এ ধরনের সেমিনারের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। শিল্পে আধুনিকীকরণের জন্য তিনি নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন, পর্যাপ্ত কাঁচামাল, সরবরাহ, রাস্তা ঘাটের উন্নতি, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিফোন টেলেক্স্ ব্যবস্থার প্রসার, অর্থলগ্নী সংস্থাগুলির উদার ঋণনীতি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে হাওড়াজেলা-পরিষদের সভাধিপতি শ্রী দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা ও তা কিভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উন্নতমানের কাঁচামালের সরবরাহ, একই মেশিনে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস উৎপাদন, মূলধন বিনিয়োগ প্রভৃতির উপর জোর দেন। তিনি শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের অনুপ্রেরণা দেওয়া, কর্মীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন অর্থলগ্নী সংস্থাগুলির উদার ঋণ নীতি, বাস্তব ভিত্তিক আমদানী নীতি, বিদ্যুতের সুষম বন্টন নীতি প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের যুগ্ম শিল্প অধিকর্তা কর ও উপ-শিল্প অধিকর্তা সি.আই.আর.আই.এর পক্ষে শ্রীরঞ্জন সেন এবং বি.ই কলেজের অধ্যাপক শ্রী বি.কে. মজুমদার প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীঅজিত ঘোষাল উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে হাওড়া জেলায় হাল্কা ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ছাড়াও সমস্ত রকম কুটির শিল্পগুলিকেও চাঙা করা হবে।

সভাপতির ভাষণে হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা-শাসক (উন্নয়ন) এই আলোচনাচক্রের উপকারিতার কথা উল্লেখ করে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে পরিবেশ দূষণ রোধ ও লাগোয়া কল-কারখানাগুলির পরিবেশ গত উন্নতির কথা ব্যক্ত করেন। আর্থিক সংস্থাগুলিকেও আরও অধিক আর্থিক সাহায্য দানে উদার মনোভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

বনগ্রামে ৩৮-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭ বনগ্রাম থানা ময়দানে ভারতের ৩৮-তম প্রজাতন্ত্র দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ৯-টায় বনগ্রাম মহকুমা শাসক পতাকা উত্তোলন করেন এবং বনগ্রাম পুলিশ বাহিনী ও বিভিন্ন সংস্থার সম্মিলিত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন বনগ্রাম জরুরী বাহিনী, রিজার্ভ হোমগার্ড বাহিনী, এন.সি.সি. বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, অভিযান সংঘ মনিমালা, জি.বি.এস.ক্লাবের মনিমেলা, কিশলয় মনিমেলা, বাংলার ব্রতচারী সমিতি বনগ্রাম শাখা, ব্রতচারী নায়ক ও প্রতাপগড় মনিমেলা। কুচকাওয়াজ শেষে বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক বিভিন্ন খেলা ও নৃত্যগীতি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

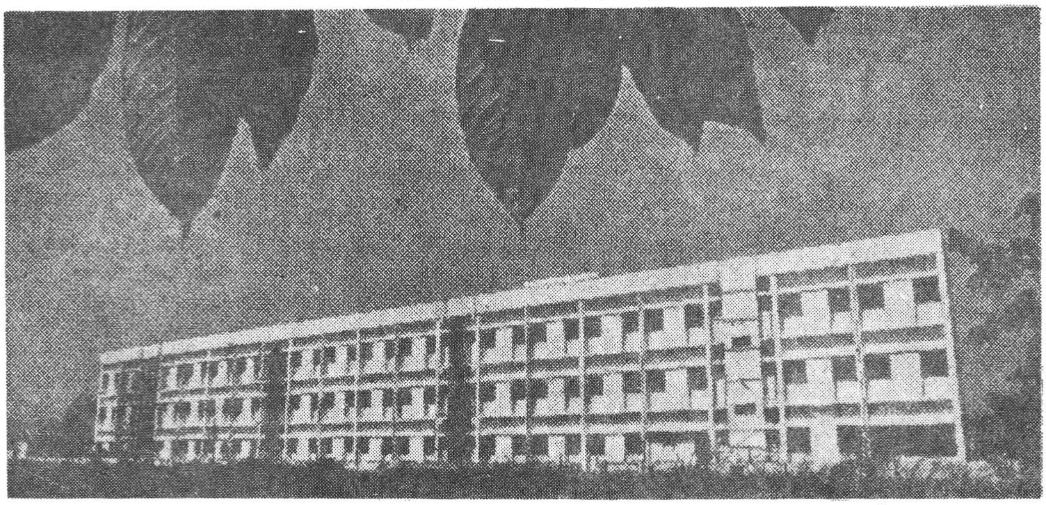
বনগ্রামে সর্বধর্মীয় প্রার্থনাসভা

গত ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৭ সকাল ৯-টায় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব দিবস উপলক্ষে বনগ্রাম শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে এক সর্বধর্মীয় প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রামধনু সংগীত দিয়ে সভা আরম্ভ হয়। বনগ্রাম মহকুমা শাসক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। অনুষ্ঠানে বেদ থেকে পাঠ করে শোনান বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শিখ ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনান হরচাঁদ শিং আনন্দপুরী। কোরান থেকে পাঠ করে শোনান মহম্মদ সাহাদত হোসেন এবং বাইবেল থেকে পাঠ করে শোনান ফাদার লিবারাথুস। রামধনু সংগীত দিয়ে সভা শেষ হয়।

কলকাতা থাকার স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর পরিবেশ

উদয়াচল পর্যটক আবাস

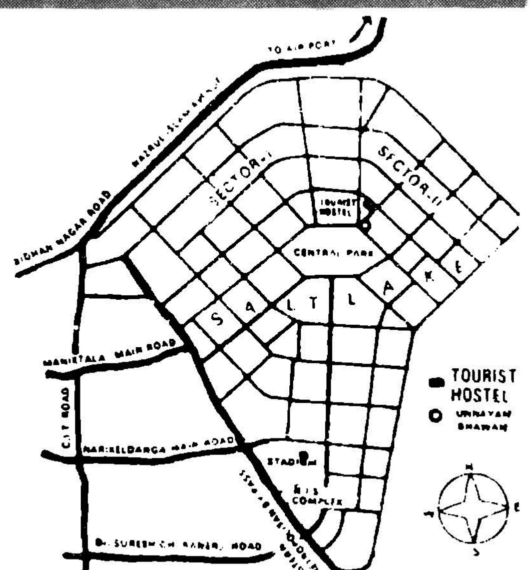
বিধাননগর (সল্টলেক)



উপনগরীর ২নং সেক্টারে উন্নয়ন ভবনের পাশেই এই পর্যটক আবাস। মধ্য কলকাতা থেকে মাত্র ৮ কি. মি.। বাসে মিনিবাসে সরাসরি যোগাযোগ - হাওড়া ১২ কি. মি. শিয়ালদা ৬ কি. মি। বিমানবন্দর ১০ কি. মি। ডরমিটরিতে একত্রে মিলে মিশে থাকার সুব্যবস্থা। সভা সম্মেলন আয়োজনের সুব্যবস্থা। সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় সব রুচির উপযোগী আহার্য দ্রব্য।

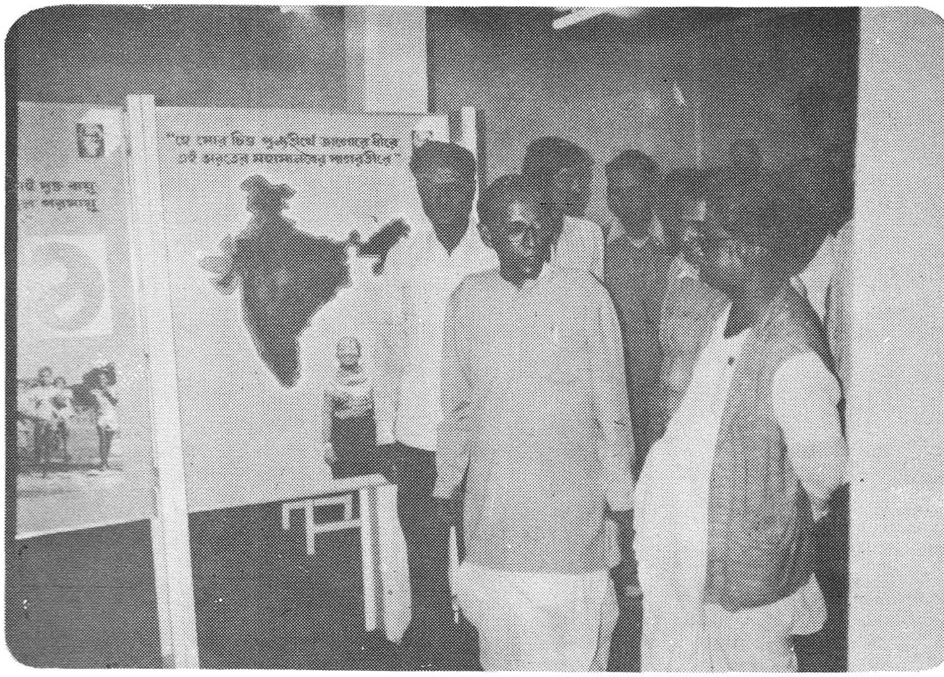
থাকার খরচ (প্রত্যহ) : মাথাপিছু ১৫ টাকা (ডরমিটরি), ৬০ টাকা (৪ শয্যাবিশিষ্ট ঘর), ১০০ টাকা (বাতানুকুল দ্বি-শয্যাবিশিষ্ট ঘর), ৪০ টাকা (সাধারণ দ্বি-শয্যার ঘর)।

এল ১৪বি, এল ১৪সি, ১৪ডি, এস. ১৪, এস ১৬, ৯ সাটল (মাণিকতলা থেকে), ৪৬এ: ২০১, ১২ (খিদিরপুর থেকে)। হাওড়া-সল্টলেক মিনিবাস, যাদবপুর সল্টলেক মিনিবাস, আলিপুর চিড়িয়াখানা-সল্টলেক মিনিবাস।

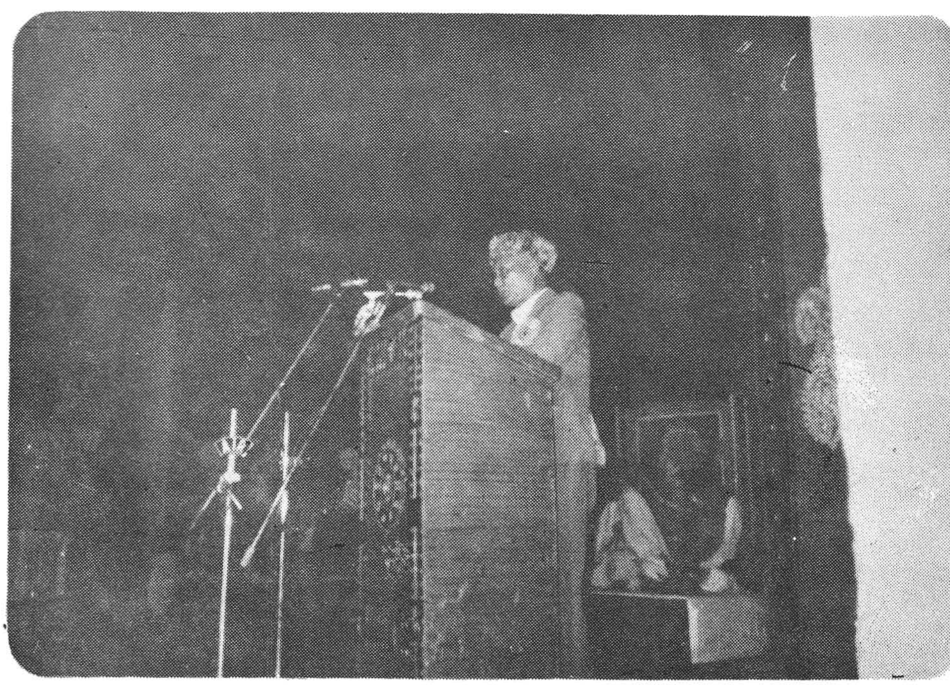


বিশদ বিবরণ ও সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ করুন : **ট্যুরিস্ট ব্যুরো**

৩/২, বি. বা. দী বাগ (ইস্ট)	১, নেহেরু রোড	হিলকার্ট রোড	এ/২, স্টেট এমপোরিয়া বিল্ডিং	করিম ম্যানসন
কলিকাতা-১	দার্জিলিং	শিলিগুড়ি	বাবা খড়্গ সিং মার্গ	৭৮৭, আন্না সালাই
ফোন: ২৩-৮২৭১	ফোন: ২০৫০	ফোন: ২১৬৩২	নয়া দিল্লী-১১০০০১	মাদ্রাজ ৬০০০০২
			ফোন : ৩২৩৮৪০	ফোন ৮৭৬১২



পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত আগরতলায় ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী-প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী এবং তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার।



আগরতলায় ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণরত ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত

